বাতায়ন

আলোকিত

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ ।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

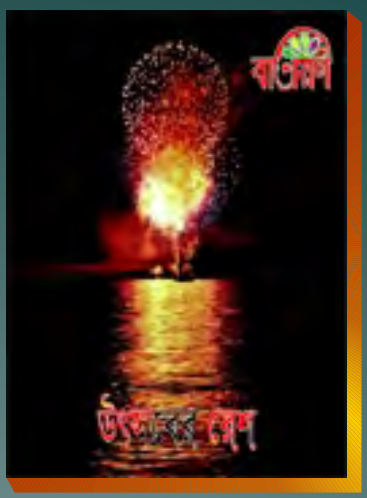

বাতায়ন

নবম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৭

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Issue Number 9 : October, 2017

EDITORS

Ranjita Chattopadhyay, Chicago, IL
Jill Charles, IL, USA (English Section)

DESIGN AND ART LAYOUT

Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTO CREDIT

Tirthankar Banerjee, Perth, Australia
John Knight, Cairns, Australia
Balarka Banerjee, Sydney, Australia

INSIDE COVER PAINTING

Manjistha Roy, Howrah, India

PUBLISHED BY

BATAYAN INCORPORATED, Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

আগুনের পরশমণি

বাঙালীর বড় উৎসব দুর্গাপুজো শেষ। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? জানালার বাইরে চোখ রাখলে দেখা যায় গাছের পাতায় সোনা রোদের লুটোপুটি। শরৎ-হেমন্ত, বাংলায় এই দুটি ঋতুর নাম একসঙ্গে বলা হয়। ইংরাজীতে এই ঋতুদুটির নাম হল autumn। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি কীটসের বর্ণনায় এ হল, ''Season of mists and mellow fruitfulness.'' বাংলায় শরৎ পরিপূর্ণতার ঋতু। আর হেমন্ত হল ধানকাটা মাঠে নেমে আসা নিঃসীম শূনত্যার ঋতু। শূন্যতা আর পূর্ণতা একই আবর্তের দুই বিপরীত বিন্দু। আর এই আবর্তের ওঠাপড়ার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বজোড়া মহোৎসবের সুর। উৎসবের রেশ তাই লেগেই থাকে কোন না কোন ভাবে।

সেই সুরে সুর মিলিয়ে এবার প্রস্তুতি দীপাবলীর জন্য। দুর্গাপুজোর শেষে মনের আনাচে কানাচে জমে থাকা অবসাদ আর ক্লান্তি দীপালিকার আলোয় ঘুচে যাক। দীপাবলী আলোর উৎসব। সারা পৃথিবীতে অশান্তি, হিংসা আর অসহিষ্ণুতার অন্ধকারের কালিমা এই দীপাবলীতে একেবারে মুছে যাক এই প্রার্থনা। আগুনের পরশমণির স্পর্শে পবিত্র হোক বিশ্ববাসীর অন্তরাত্মা। ফুটে উঠুক নতুন তারা। সেই তারার আলোয় আলোকিত হোক সামনের পথ।

পুজোর পরে পুজোসংখ্যা বাতায়ন তুলে দিচ্ছি পাঠকদের হাতে। জননী উমা ফিরে গেছেন কৈলাসে। বিসর্জনের বাজনা গেছে বেজে। ফাঁকা পুজো প্যান্ডেলে ঘুরতে ঘুরতে মন হু হু করে ওঠে বৈকি ! মনে হয় কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। এমনকি আমাদের মতো প্রবাসী বাঙালীদের, যাদের মনে কিনা পুজোমন্ডপ একটা স্মৃতি, তাদেরও মনটা একটা হাল্কা বিষন্নতায় ভরে থাকে এই সময়ে। আশা করি আমাদের পুজোসংখ্যা আনন্দ দেবে আপনাদের। আগামী উৎসবের আশায় উৎসাহিত হবেন সকলে। পুজোকে ঘিরে বাংলা এবং বাংলার বাইরে বাঙালীদের নানা অনুভূতির কিছু কিছু ধরা রইল আমদের এই সংখ্যাটিতে। এছাড়া আমাদের নিয়মিত বিভাগ তো আছেই। আছে একটি নতুন সংযোজন-রন্ধনপ্রণালী। রসনার পরিতৃপ্তিতে উৎসবের পরিপূর্ণতা।

বছরের বাকী দিনগুলো আপানাদের আনন্দে কাটুক। সকলে ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের ওয়েবসাইট www.Batayan.org দেখতে ভুলবেন না। মনের জানালায় যে সব ছবি ফুটে উঠছে তা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলাম।

দীপাবলীর শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অস্ট্রেলিয়ায় কবি শ্রীজাত

বিশেষ অভিজ্ঞতা	অনুশ্রী ব্যানার্জী	2
শ্রীজাত-র সঙ্গে কিছুক্ষণ	সিদ্ধার্থ দে	4
Aussie Celebration of an Enigma of Our Time, Srijato	Suparna & Subir Chatterjee	8

Bangla Section

বাঙালীয়ানা
বালার্ক ব্যানার্জী 10

হিম হেমন্ত . . . . আবার কবিতা কি ?
ইন্দ্রাণী মন্ডল 11

প্রতিবেশিনী
আনন্দ সেন 13

ফেরার পথে
মানস ঘোষ 14

কবিতা — মুখবন্ধ
শুভ্র দাস 15

কবিতা
শুভ্র দাস 16

হ্যানসেল
ইন্দ্রাণী দত্ত 17

আল্ট্রা ভায়োলেট
ইন্দ্রাণী দত্ত 17

কুসুমের মাস
ইন্দ্রাণী দত্ত 18

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?"
দেবীপ্রিয়া রায় 19

বলো ভাই কী দাম দেবে ?
সুজয় দত্ত 26

লিমেরিক
শুভ্র দত্ত 33

তুমি রূপকথা নও
বর্ষণজিৎ মজুমদার 35

আগে হলে
সুস্মিতা বসু 36

মেঘ প্রতিশ্রুতি
স্বর্ভানু সান্যাল 37

পিন্টুর পঞ্চমী
পিনাকী গুহ 38

ছেলেটা
লালী মুখার্জী 40

বিপন্ন শৈশব
পিয়ালী গাঙ্গুলী 43

সুর ঝঙ্কার
অনিতা মুখোপাধ্যায় 46

স্পটলাইট, ২০১৭, অ্যান আরবরে নাট্যোৎসব
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় 47

শিলং-চেরাপুঞ্জি
অর্পিতা চ্যাটার্জী 51

"পাতুড়ি"
পুরবী মজুমদার 59

English Section

America Is Great
Jill Charles 63

An Exciting Book
Larry Ambrose 64

Cocoa...
Tinamaria Penn, Chicago 65

Destiny
Bani Bhattacharyya 66

Lufthansa Lip Balm
Mita Choudhury 68

Moon Is Love
Allen F. McNair 69

It's All in the Family
Abhishek Roy 70

My Name Is Ida Mae
David Nekimken 72

On My Mother's 120th Birthday: The Ideas of a New Generation
Lew Rosenbaum 73

One November Afternoon
Maureen Peifer 76

Pilot Terror
Kathy Powers 78

Spoon
Viola Lee 79

Swarga in America
Souvik Dutta 80

Does Art Have to be Smart?
Shreya Datta 82

Dawn Train
Balarka Banerjee 83

অস্ট্রেলিয়ায় কবি শ্রীজাত বিভিন্ন মুহূর্তে

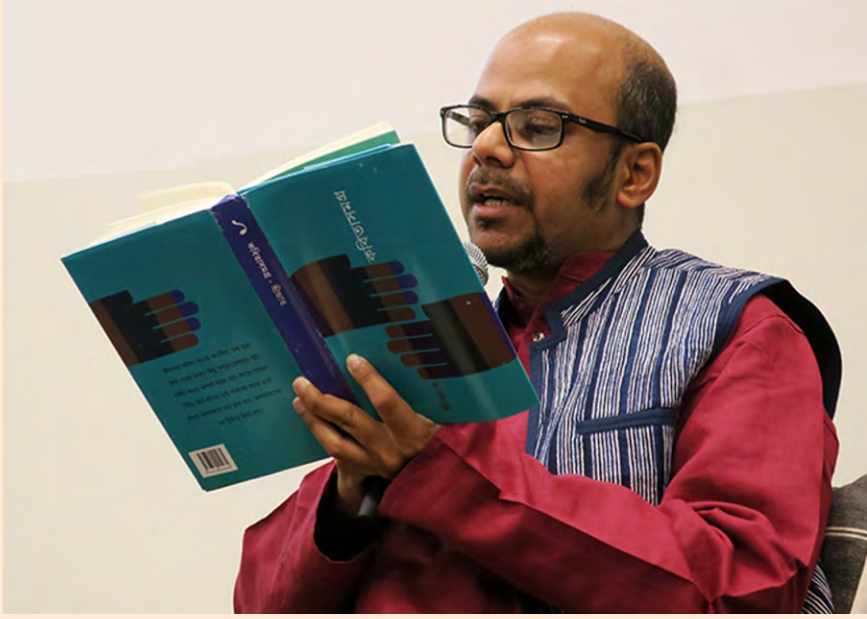

বিশেষ অভিজ্ঞতা

অনুশ্রী ব্যানার্জী

সিডনীতে শ্রীজাতর ''একাই এক show'' অনুষ্ঠানে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম । সেই উপলক্ষে কয়েকদিন কবির সাথে নানা ভাবে কাটাবার কথা বলতে গেলে এইখানে শুরু করতে হয় —

গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সিডনী শহরে হৈ চৈ লেগে গেল । এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষ উদগ্রীব অপেক্ষায় তাকিয়েছিল ২রা সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যার দিকে । এই দিন ছিল কবি শ্রীজাত-র একাই একশো অনুষ্ঠান ।

'আনন্দধারা' আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সিডনীর বাঙালীদের সুযোগ করে দিল কবি শ্রীজাতকে খুব কাছ থেকে পাবার । কর্ণধার শ্রীমন্ত মুখার্জি এই কর্মকান্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বিগত তিনমাস আগে থেকে । এ যেন মেয়ের বিয়ের আয়োজন । কোনো ত্রুটি যেন না হয় । সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বহু মানুষ বাংলা ভাষা যাদের প্রাণ । সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহে এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেল ।

৩০ শে আগস্ট রাত্রে স্ত্রী দূর্বা সহ শ্রীজাত-র আগমন সিডনী শহরে ।

বাসস্থানের বসার ঘরে ঢুকেই বললেন আড্ডার জন্য ঘরটা দারুণ । এত রাস্তা পেরিয়ে আসার কোন ক্লান্তি নেই । মিষ্টি হেসে দুজনেই মিশে গেলেন উপস্থিত সিডনীবাসীদের সাথে, যেন কত দিনের চেনা । নানা ছোটখাট কথা — ওরই মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব । সকলের সাথে পরিচয় হওয়ার মধ্য দিয়েই পাওয়া গেল শ্রীজাত'র আন্তরিকতার স্পর্শ । রাতে খাওয়ার টেবিলে দেখা গেল ঘরোয়া বাঙালী খাওয়া তাঁর খুবই পছন্দের । গৃহিনীর বিশেষ অনুরোধে সব খেতে হবে, ফ্রিজে কিছু ঢুকবে না শুনে বললেন, ''তাহলে তো আমাদেরই ফ্রিজে ঢুকতে হবে'' ।

মিষ্টভাষী, শান্ত এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ শ্রীজাতকে নানা রকম ভাবে সিডনীবাসীর জানা হল । সকলের সব কথা মর্যাদা দিয়ে শোনা এবং তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়া খুবই আনন্দ দিয়েছে সকলকে ।

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীজাত ও দূর্বাকে নিয়ে যাওয়া হল সিডনী শহরের জীবন যাত্রা দেখাতে Rocks-এ । শ্রীজাতর আগ্রহে Aussi Pub-এ ওদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো । ঝলমলে দিনটায় শ্রীজাত ও দূর্বার মনও খুব খোলামেলা খুশীতে ছিল । Rocks-এর চারদিকই ছিল জমজমাট । মেলা বসেছে, নানা দেশের খাবারের স্টল ও নানা রকমের গান বাজনা । এক জায়গায় তিনজন শিল্পী চেলো, গিটার ও ক্লারিওনেট বাজিয়ে মনভোলানো

সুরলহরীতে ভরিয়ে দিয়েছে। তাদের কাছটি ওঁর অতি প্রিয় জায়গা বোঝা গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন অনেকক্ষণ, দূর্বাকেও ডেকে নিয়ে এলেন বাজনা উপভোগ করার জন্য। পরদিন ফেসবুকের পাঠকরাও পেয়েছেন এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কবিতা ছবি সহ। ''ঝলমলে রোদ এবং হাওয়া কিছুটা উত্তুরে / বাজছে সকাল চেলো, গিটার, ক্ল্যারিনেটের সুরে . . .'', Rocks-এর জলের কাছে জায়গাটা ও তার পরিবেশ চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ল শ্রীজাতর কাছে তাঁর দৃষ্টিতে, যা বাঙালীদের আনন্দ দেবে।

এরপর শ্রীজাত ও দূর্বাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য Pub-এ নিয়ে যাওয়া হলো। Aussie Pub culture আর সেখানের হৈ চৈ তে তিনি আনন্দিত, খুবই উপভোগ করছিলেন সব কিছু। এটা বিশেষ ভাবে সকলের নজর কেড়েছে — তাঁর ভিন্ন স্বাদের খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ। অস্ট্রেলিয়ায় যে সব মাছ-মাংস শ্রেষ্ঠ তারই কিছু শ্রীজাতর খাদ্য তালিকায় ঢুকল। স্বল্পাহারী, তবুও খুব উপভোগ করে খেলেন। এবার গল্প সকলের সাথে হৈ হৈ করে। উদারমন ও চিন্তাধারা, খাওয়া দাওয়া এবং কোন ব্যাপারে সংস্কারের মেঘ তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। আমরা যারা সেদিন শ্রীজাতকে এত কাছ থেকে দেখেছিলাম — মুগ্ধ হয়েছিলাম একথা বলে আনন্দ পাই। শ্রীজাত আজকের বাঙালীদের কাছে কেন এত প্রিয় তা বুঝতে কারো দেরী হয়নি। খাবার পরে শ্রীজাত গিয়ে বসতে চাইলেন Harbour-এর জলের কাছে। এক পাশে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। দেখে মনে হল অন্য জগতে আছেন।

তারপর Contemporary Art Museum-এ নিজের মনে ঘুরে বেড়ালেন। সেও অন্য শ্রীজাত। Museum-এর ছাদে বসে কফি নিয়ে আড্ডাতে আবার চেনা বন্ধু শ্রীজাত। দূর্বার সাথে Sydney-র skyline উপভোগ করা ও নানা মজাদায়ক মন্তব্যে বিকেলটা ভারি সুন্দর কাটলো। সপ্রতিভ ঠাট্টা তামাশা করেন যার অনেক কথাই মনে দাগ কাটে। ওই কদিনে সিডনীবাসী বাঙালীরা শ্রীজাত ও দূর্বাকে নিজের বাড়ির সদস্য করে নিয়েছিলেন।

২রা সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় শ্রীজাতর নানা কথা, কবিতা পাঠ, গান গাওয়া ও নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলা — ভরিয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যাটি। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। সকলের সাথে খোলামেলা মেলামেশা, আন্তরিক ভাবে প্রশ্ন-উত্তরের আলাপন — সব মিলিয়ে শ্রীজাত যে একাই একশো তা সিডনীবাসীর কাছে এক বিশেষ পাওয়া।

ভাললাগা থেকে ভালবাসা — পুরো জায়গাটা তিনি ভরিয়ে দিয়েছেন। কাছের মানুষ অথচ এক অসাধারণ কবিসত্ত্বা — এই অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

> ''দখিনা তো সেই বাঁধনহারা বাতাসের নাম, যে বন্ধ জানালার পাল্লা খুলে দিতে পারে এক ঝাপটায়। সেই তাজা বাতাসের দিকেই আজ বাড়িয়ে দিলাম হাত।''
>
> শ্রীজাত
> সম্পাদকীয়, দখিনা
> 'আনন্দধারা'-র ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকা

শ্রীজাত-র সঙ্গে কিছুক্ষণ

সিদ্ধার্থ দে, Canberra

সম্প্রতি এখনকার প্রখ্যাত কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দিনদুয়েকের জন্য পেয়েছিলাম ক্যানবেরাতে । ওঁর আসাটা সপ্তাহের মাঝে হওয়ার জন্য সাহিত্য সন্ধ্যা জাতীয় কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি । তবে ক্যানবেরার মানুষের জন্য ওঁর একটি ছোট সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল । প্রশ্নগুলি ঠিক গতানুগতিক ছিল না, বলা যায় আলোচনাটা হয়েছে আড্ডার মেজাজে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির ক্যাফেটারিয়াতে কফি খেতে খেতে । সঙ্গে ছিলেন কবি পত্নী দূর্বা । কবির ছোটবেলার কথা, বাড়ির গান বাজনায় ভরা আবহাওয়া, ব্যতিক্রমী জীবন ও জীবনদর্শন – অনেক কিছু ঘিরে ছিল উপভোগ্য মিনিট পনেরোর সাক্ষাৎকারটি ।

সাক্ষাৎকার : চন্দনা দে ।

অনুলিখন : সিদ্ধার্থ দে ।

চন্দনা : আমার শুরুর প্রশ্নটা একটু অন্যরকম, তা হচ্ছে শ্রীজাত কথাটার মানে কি ?

শ্রীজাত : শ্রীজাত মানে শ্রী হইতে জন্ম যার ।

চন্দনা : শ্রী মানে তো লক্ষী . . .

শ্রীজাত : হ্যাঁ । আমার এই নাম রেখেছিলেন আমার মামা – আমার মায়ের নাম আসলে শ্রীলা । হতে পারে মায়ের নামে প্রভাবিত হয়েছিলেন । অথবা শ্রী বা সুন্দর থেকে জন্ম যার এটাও হতে পারে ।

চন্দনা : আর কোন শ্রীজাত-কে জানেন ?

শ্রীজাত : সত্যি বলতে কি, না । আমি অন্তত শুনিনি ।

চন্দনা : এই নামের জন্য কোন সমস্যা হয়েছে কি ?

শ্রীজাত : এখন আর অবশ্য লেখালেখিতে পদবী ব্যবহার করিনা । না, ইস্কুলে আমার বাবা পদবী লিখেছিলেন ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ । ইংরেজীতে এই পদবীর তিনটি Y, তিনটি A-র জন্য কিছু অসুবিধে হয়েছে অবশ্য বিদেশ ভ্রমণের সময়ে । আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল বাংলাদেশে – এক ভদ্রলোক আমাকে Mr জাত বলে সম্বোধন করেছিলেন – শ্রী জাত থেকে . . .

চন্দনা : ছোটবেলার কথা তো বিশেষ মনে থাকে না আমাদের, তাও যখন ছড়া টড়া লিখতেন কি অনুভূতি হত মনে পড়ে ?

শ্রীজাত : মজা পেতাম । কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল বাড়িতে খুব উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে, যেহেতু বাবা খবরের কাগজে কাজ করতেন . . . তখন যুগান্তর পত্রিকার খুব রমরমা ছিল, বাবা সেই পত্রিকায় senior sub-editor-এর কাজ করতেন । প্রথমে বলতেন যে তুই বিভিন্ন কাগজে তোর লেখা পাঠা, দেখ না ছাপা হয় কিনা ।

চন্দনা : উনি জানতেন কি করে, যে আপনি লিখেছেন ?

শ্রীজাত : আমি লিখে কিন্তু শোনাতাম । আমার কখনই পাপবোধ ছিল না যে কোন গর্হিত কাজ করছি . . . ফলে বাবা মাকে শোনাতাম, ওঁরা খুব উৎসাহ দিতেন । তখন টুকটাক দু একটা লেখা ছাপা হয়েছে, যেমন তখনকার বেশ জমজমাট পত্রিকা সন্দেশের হাত পাকাবার আসরে । সেই থেকেই লেখায় উৎসাহ পেয়ে গেলাম, যেটা এখনও চলছে ।

চন্দনা : স্কুল কলেজ জীবনের কথা কিছু বলবেন ?

শ্রীজাত : স্কুলের শেষ দিকের বন্ধু বান্ধবরা আমাকে কবিতা পড়াত ধরে ধরে, তার আগে তো শুধু পাঠ্যক্রমে যা কবিতা আছে তাই পড়েছি । তখন তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে, পরে টিফিনের পয়সা জমিয়ে বই কেনা, এবং তারপরে বই মেলা যাওয়া শুরু হল . . . এই সব করে একটা আবহের মধ্যে ঢুকে গেলাম । সত্যি বলতে কি আমাদের কৈশোর কলকাতায় কবিতা নিয়ে একটা পাগলামী, একটা উন্মাদনা ছিল ।

দূর্বা : ওর স্কুল জীবনে বেশ কিছু like-minded বন্ধু ছিল । যারা কবিতা লিখত, পড়ত ।

চন্দনা : পারিপার্শ্বটা খুব help করে কিন্তু . . .

শ্রীজাত : অনেককেই আমি দেখেছি পরে বলতে যে এটা আমার করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাড়ির কারণে পারিনি । এমন অনেক মানুষজনকে আমরা সবাই চিনি যাঁরা সারাজীবন এমন একটা কাজ করছেন যেটা তাঁরা করতেই চাননি । এবং যেটা নিয়ে আজীবন regret করে যাচ্ছেন, কিন্তু সেই সময়ে তাঁরা বাড়িতে বলতে পারেন নি যে আমি এটা করতে চাই । কিন্তু thankfully আমার বাড়ি একটা গান বাজনার বাড়ি হওয়াতে towards Art সব সময়েই একটা open window ছিল . . . যে তুমি যা চাও তা করতে পার । বরং আমার মনে আছে যে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়িতে রোজই গান হত । যে কদিন মামা বা মা শেখাচ্ছেন সে কদিন ক্লাস, নয়তো সামনে কোন অনুষ্ঠানের জন্য রেওয়াজ চলছে । ধরুন আমরা সন্ধ্যেবেলায় পাঁচটা নাগাত পড়তে বসতাম — সাতটা নাগাদ কেউ না কেউ ডেকে নিয়ে যেত । বলত তোরা পড়াশনা করছিস, ওদিকে গান হচ্ছে না ! তারপর সাড়ে বারটা-একটা অবধি গান চলত ।

চন্দনা : তার মানে পড়াশুনাটা secondary . . .

দূর্বার সংযোজন : তোমার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার আগের গল্পটা বল . . .

শ্রীজাত : আমার মনে হয় এরকম experience আমাদের প্রজন্মের সবার আছে । মনে হয় আমাদের আগের প্রজন্মেরও আছে । পরীক্ষার আগের রাতে ডোভার লেন সঙ্গীত কনফারেন্স যার line up হচ্ছে পন্ডিত ভীমসেন যোশী, শিবকুমার শর্মা জাকির হুসেন ডুয়েট, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেব, শেষে রবিশঙ্কর . . . বিবেকানন্দ পার্কে প্যান্ডেল বেঁধে হচ্ছে । তো আমরা কয়েকজন ঠিক করেছি যাব । এদিকে পরের দিন মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা । তাও গানবাজনার আসর বলে বাড়িতে সেরকম ভাবে কিছু বলতে পারছে না, কারণ নিজেরাই গান বাজনা করে । তাও আমার যেটা মনে হল . . . I don't repent . . . by chance মাধ্যমিকে ফেল করলে বা back পেলে আবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে, কিন্তু এই line up টা কলকাতার রাতে আর কোনদিনও আসবে কিনা you don't know । So I attended । কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হয়নি আমার । তবে এ ব্যাপারে আমি sure যে সে রাতে আমি যদি না যেতাম definitely অঙ্ক পরীক্ষায় devastation হত এই দুঃখে শোকে যে এ আমি কি করলাম । সুতরাং এ কথা বলব যে আমরা অনেক freely বড় হতে পেরেছি ।

চন্দনা: তাহলে জীবনে freely বড় হতে পারার একটা ব্যাপার আছে, তাই না?

শ্রীজাত: হ্যাঁ । কারণ অঙ্ক পরীক্ষার কথা আমার আর মনে নেই, but I still remember that night... ভীমসেন জী শুরু করলেন, রবিশঙ্করজী শেষ করলেন । তবে যতদিন আমি বাঁচব মনে করতে পারব কি তাঁরা বাজিয়েছিলেন । ফলে

আমি এটা সব সময়েই বিশ্বাস করি – একটু আগেই সিদ্ধার্থদার সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল – যে যেটা ইচ্ছে সেটা করে নেওয়া উচিত, যাতে না আমার পাঁচ বছর বাদে মনে হয়, ''আরে আমার এটা খুব ইচ্ছে ছিল, করলাম না কেন?'' সেই জন্য আমি খুব ছোট থেকেই যখন যা ইচ্ছে সেটাই করেছি।

চন্দনা: সবাই কি আপনার মত lucky?

শ্রীজাত: না, luck এর চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে নিজেকে oppression এর মধ্যে দিয়ে না নিয়ে যাওয়া। অনেকের দেখেছি একটা self-restraint চলে আসে, মানে আমি এটা করব, তাহলে অমুকে কি বলবে, ওরা কি করবে, তারা কি ভাববে...

চন্দনা: এটাই তো হয়, এটাই তো বেশী, তাই না?

শ্রীজাত: আমি বলব এটা করার কোন দরকার নেই কিন্তু। মানে আমি বলছি if you have your own terms, people gradually accept it, but if they don't, তাতেই বা কি যায় আসে? মানুষ যদি accept না করে ও আমার জীবন তো আমারই, আমি আমার মত করে বাঁচব। সেটা আমি সব সময় মনে করেছি।

চন্দনা: আপনার কি মনে হয় যে কেউ পারবে এটা করতে?

শ্রীজাত: কেন পারবে না? আমি তো খুব দুর্বল মানুষ সেই অর্থে, দেখেই বুঝতে পারছেন একটা মারলেই ধুম করে পড়ে যাব। তবে বরাবরই আমি আমার ইচ্ছে মতন কাজ করেছি। যেদিন আমার মনে হয়েছে যে চাকরি ছাড়ব, কালকে খেতে পাব কিনা সেটা না ভেবেই সেদিন resignation letter টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে এসেছি। আমি একদিনও ভাবিনি তাহলে কাল কি খাব, কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমার এক্ষুনি এটা করা উচিৎ। তাতে তো কিছু ক্ষতি হয়নি আমার।

চন্দনা: তাতে কি মনে হয়না আপনি একটু lucky? Luck ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করেন?

শ্রীজাত: আমি একদমই ভাগ্যে বিশ্বাসী নই...

চন্দনা: কাজে বিশ্বাসী?

শ্রীজাত: একদমই।

চন্দনা: তবে একটা প্রশ্ন, যদি কেউ চাকরি ছেড়ে দেবে মনস্থ করে, যদি বাড়িতে তার ওপর নির্ভরশীল কেউ থাকে সে কি করবে? মানে idea টা কি?

শ্রীজাত: বাড়িতে সেরকম কেউ অবশ্য তখন ছিলনা।

চন্দনা: তবে কি সেই জন্যই চাকরি ছাড়তে পেরেছিলেন? নাকি আপনার মনে হয় আপনি এমনিতেই তা করতে পারতেন?

শ্রীজাত: দেখুন আমি অনেক সময় অনেক কাজ করেছি যা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে হয় হঠকারিতা। যেমন পড়াশুনা ছেড়ে কলেজ drop out করা। তবে রোজগার তো করতেই হয় কোনভাবে। যেমন আমি গত ছ সাত বছর চাকরি করি না, তাও তো খেয়ে পরে বেঁচে আছি। তাই মনে হয় যা ইচ্ছে সেটা করাই বোধহয় আমাদের উচিত।

চন্দনা: ইচ্ছের বাইরে কি কিছু করেন না? মানে সময়ে সময়ে করতে কি বাধ্য হয়েছেন? যেমন ধরুন ফরমায়েশী লেখা বা সিনেমার গান লেখা?

শ্রীজাত: সিনেমার গানের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাকে এমন কিছু লিখতে বলা হয়না যা আমি পারবনা। আর আমাদের আর একটা সুবিধে হচ্ছে যে আমরা যখন সিনেমার গান লিখতে আরম্ভ করেছি তখন আমাদের বন্ধুবান্ধবই ছবি বানাচ্ছে -

so we are a single team । আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের সঙ্গে আমার age gap বড়জোর দশবছর । সুতরাং তারা আমাকে এমন কাজই দেয় যেটা আমার comfort zone এ . . . সুতরাং গান লিখতে গিয়ে আমাকে কখনই খুব বেশী টানতে হয়না । অনেক সময় আবার খবরের কাগজের জন্যও কিছু ফিচার লিখতে হয়, যেমন ধরা যাক মন খারাপ নিয়ে একটা বড় লেখা দিতে বলা হল । তখন হয়তো আমার মন খারাপ নিয়ে লেখার ইচ্ছে নেই, কিন্তু একটু concentrate করে মন খারাপ নিয়ে কিছু একটা লিখলাম । তবে এই ধরণের লেখা বড়জোর পাঁচ পারসেন্ট, বাকি পঁচানব্বই পারসেন্ট কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের শর্তে লিখেই রোজগার করার চেষ্টা করি । অবশ্য কিছু সময় বিজ্ঞাপনের জন্য লিখতে হয়, যেমন ধরা যাক শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন । লিখতে হচ্ছে ঘন কালো চুলের জন্য যেটা experience করার কোন উপায় আমার নেই . . . সেটা এমন feeling দিয়ে লিখতে হচ্ছে যেন আমি শ্যাম্পুতে ডুবে থাকি সারাদিন . . . এটুকু জালিয়াতি আমাদের করতেই হয় পেটের জন্য ।

চন্দনা : চ্যালেঞ্জ তো শিল্পীদের অনেক নিতে হয়, কোনটা বেশ বলবার মত ?

শ্রীজাত : কিছু সময়ে সুরকার আমাদের tune টা দিয়ে যান । আমাদের সেই সুরে কথা বসাতে হয় ছবির situation অনুযায়ী । সফল হলে মনে হয় সুরকার আমাকে কাবু করতে পারলেন না ।

চন্দনা: এই চ্যালেঞ্জ নিতে আপনার musical training কি কাজে লাগে ?

শ্রীজাত : নিশ্চয়, সঙ্গীতের শিক্ষাটুকু না থাকলে বোধহয় এই কাজটা করতে পারতাম না ।

চন্দনা : অনেক ধন্যবাদ । শেষ করার আগে ক্যানবেরার মানুষের জন্য কিছু বলবেন ?

শ্রীজাত : মাত্র দুদিনে ক্যানবেরার আর কতটুকু জানা যায় ? তাও অনেক ভাল মানুষের সঙ্গে দেখা হল, এটাই পাওয়া । পরের বার ক্যানবেরার natural beauty আর একটু ভাল করে দেখার, মানুষজনের সঙ্গে আর একটু ভাল করে আলাপ করার ইচ্ছে রইল । অবশ্য এরই মধ্যে জ্যাকসন পোলক আর ক্লদ মোনের ছবি দেখে গেলাম — এটাই বা কজনের ভাগ্যে জোটে ?

Aussie Celebration of an Enigma of Our Time, Srijato

Suparna & Subir Chatterjee, Perth

A poet with fine taste for scotch and coffee who has broken down the established fragmentation of prose, poetry and music, heartthrob of the millennium's generation, spent some time in the continent of Australia. Being far away from Europe and US, Australia has long missed out on the sought-after presence of many imminent poets, authors, vocalists and established names who are touring regularly to promote Indian culture across foreign domain. In the US, Bongo Sonmelon has successfully made artists from both popular and the traditional genre of Indian culture and arts, easily accessible to local Indians, while Australia with its sparse population continues in its dry isolation. Sporadically through individual and at times government supported events there has been celebration of Indian artists but not at the frequency nor abundance as in the US or Europe. Hence having a contemporary artist of the time visiting multiple cities of this remote continent was indeed a big deal.

Srijato Bandopadhay, born in a musical family, grandchild of classical vocalist Tarapada Chakravarty, was destined to be a classical singer yet soon realised that within the structured melody of Hindusthani music, he was unable to fully express his creative free spirit. He took up poetry at this early time, later winning Ananda Puroshkar with his published poem anthology, *Uronto Shob Jokar*. Srijato soon knew that he would be experimenting with genre, breaking down myths and testing for mast to create his own unique style. A prolific writer, yet Srijato finds time to compose songs, and in recent days he created history translating Mirza Ghalib in Bengali. The thought of ghazal in Bangla may have sounded like an adventurous expedition but when we have an inspiring spirit like Srijato who likes to experiment and traverse boundaries, it is well expected.

Beginning a 15-day tour of Australia, already having made his mark in Sydney, Canberra and Melbourne along with a personal trip to Cairns, he arrived with his wife at our sleepy Perth airport on aFriday,September15,2017. Their flight was delayed by few hours yet the highly active poet with a lightly packed backpack came striding down the escalator looking around him with great enthusiasm. His wife had her face painted with small brown and white dots by an Indigenous

artist while on their tour to Cairns. She proudly displayed the Aboriginal art of face painting, explaining the subtext of various intricacies involved in the drawing and her chance meeting of the artist during their travel. Looking at them in admiration, factual details rolled off, all we remember was a profound happiness and immense respect that engulfed us. We were already warming up to the guests, at times struggling to maintain an expected distance of awe around a star artist of Srijato's reputation.

On Saturday September 15, we had our Srijato event scheduled at the Hill Theatre of Murdoch University. Keeping in mind the busy social calendar of our sleepy town especially at this time of the year, we expected a small gathering. All those who promised to attend the event, mostly could make it and they were not disappointed. Contrary to the anticipation of a boring evening with a poet conversing in Bangla while expanding on intellectual poetic concepts, it turned out to be a thought-provoking and entertaining evening that we all will remember fondly over the coming days. With a down-to-earth man who explained various complexities of life in an uplifting manner, the audience never knew how the duration of three hours ticked off. In sharing an anecdote of his life, Srijato gave us a profound insight to the ultimate definition of poetry. He fondly recollects that during a writers' festival tour, while travelling, he and other poets were waiting for a tube rail at a metro station. One of the visiting poets came up with a distinctive proposal of reciting poetry in their own language while waiting for the train. With an almost deserted platform, the poets took their turns to recite a poem of their choice in their own language. A young schoolgirl was their only audience. As each took their turn to recite, none understood the other but in the growing dark silence of the night, it was the rhyme, the pause and tonal expression crisscrossing the globe that created magic for the night. Srijato recited a poem by Shonkha Ghosh, and he coyly added, "That is the only poet I can ever remember." Then one from their writers' group approached the girl at the platform, requesting that she recite a poem. She declined politely on the grounds that she couldn't remember anything. With the writers' continuing insistence she obliged, quietly putting down her backpack on the platform and performed a three minutes ballet piece. Then she stopped and added with a shy smile, "This is the only poetry I know." The poets remained silent while the train streamed through and all boarded without another word. Srijato added on the evening in September for us, "And, my friends, that night, this 15-year-old girl taught us once more, poetry is not bound through a format, nor language or culture. Poetry is a free spirit."

The trance that engulfed those poets on that night, extended through the evening of the 16th of September as we all absorbed every word of this quiet and soft-spoken speaker until it was time to say Adieu.

On the 19th of September we exchanged our warm and friendly goodbyes, quietly penning down numbers with many promises of catching up when back in Kolkata. As we settle back with our daily chores, humming in tune with the regularities, yet in every corner of our house we feel poetry resonate whether through Facebook postings or the sombre mood while the poet's fingers drummed on the keypad, all fondly etched in our memory. The poet is busy again in his own element, strumming words that speak a million protests on anarchy and chaos that waltz to the time of now. And we have resumed our routine life at work balancing with various demands of life. Yet the 72hours spent with an enigma of now will be treasured forever as the Aussie celebration of Srijato brings colour of spring in our humdrum Perth lives.

বাঙালীয়ানা

বালার্ক ব্যানার্জী, Sydney

বন্ধ বিদেশী ইশকুলে
হঠাৎ জেনো আজ ফুটল ফুল,
এই হাওয়াতেও নাকি পুজোর গন্ধ
শুধু মনের মধ্যে হুলুস্থুল ।
সেই একই হাসি, একই বাদ্যি
সেই মাইকে বাজছে অনুপম ।
এক দিনেতেই পুজো শেষ
মনটা বড়, সময় বড় কম ।
মাংস দিয়ে খিচুড়ি চলছে
ঘুগনি, ফুচকা – একটু ঝাল করে ।
গাড়ির পেছনে বার বসেছে
হুইস্কি, একটা সিগারেট ভাগ করে ।
তারার তলায় কারা গান ধরেছে
মঞ্চে নাচছে কচি কাঁচারা ।
কেউ বিলেতি কবিতা বলছে
রবীন্দ্রনাথের পরেই কিশোর-দা ।
পুরনো শত্রু, পুরনো বন্ধু
মুখোমুখি আবার সেই ভাসান নাচে ।
সবাই মিলে সিঁদুর খেলা
হাত ধরে টেনে নেবে কাছে ।
তাই নাস্তিক হয়েও পুজোয় যাই
সব ধর্মের সাথে প্রসাদ খাই ।
অজান্তে করে ফেলি প্রার্থনা,
Hindutva নামে ওরা যুদ্ধ করুক
আমার ধুনুচি নাচটা জমুক
বেঁচে থাকুক বাঙালীয়ানা ।

Balarka Banerjee is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

হিম হেমন্ত . . . . আবার কবিতা কি ?

ইন্দ্রাণী মন্ডল, Chicago

ফি বছর পুজোর পর
বাসি উৎসবের গলে যাওয়া রঙ নিয়ে
এই হিম হেমন্তে
অভিবাসী সীডার বনের সিরসিরে ফিস্‌ফাস্‌ মেখে
আবার কবিতা কি - - - -

এসে দাঁড়াই যখন
লাল মোজেকের সিঁড়ি বেয়ে এক ছুটে
তেতলার বড় গোল ঘর লাগোয়া
লম্বা গাড়ি বারান্দায় - - - -
পুজোর সাত দিন এই এখানে
মার্বেল মেঝেতে পাত পেড়ে
ভোজ হয়েছে নিরলস
গোটা পঞ্চাশেক আত্মীয় বন্ধুর - - - -
মধ্যাহ্নে, রঙমেশালি বিবিধ খিচুড়ি,
মুসুর গোবিন্দভোগ; ভাজা মুগ বাসমতী আর চারডালের ভুনা;
পাঁচ ভাজা, সাত সবজি, পায়েস, চাটনি - - - -
আর মায়ের বোধন ব্যতিত, প্রতি সন্ধ্যায়
বাহারি রকমারি আমিষ - - - -
ফি বছর পুজোর পর
নিঃশেষ ধূপধুনোর সাথে সে সব গন্ধ নিয়ে
এই বিক্ষিপ্ত হাওয়ায়, আবার কবিতা কি - - - -
যখন চওড়া লাল পেড়ে ঘি-গরদে মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে
কাঁধে ফেলা চাবির ঝন্‌ঝন্‌ অনুরণীয়ে
বড় লাল সিঁদুর-টিপ বড়মা
ছাদের রান্নাঘর ছেড়ে ভোজনরত আমাদের দৌরাত্ম্যর মাঝে
পৈতে-পরা পুজোর ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে
আলো করে এসে দাঁড়ায়
এই নিশিডাকা সন্ধ্যায়, ঠান্ডা বৃষ্টিতে - - - -
সে কি আমাকে এক চুমুকে
গরম দুধের রূপোর বাটি শেষ করতে বোলে
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে যায়
বড়দাদার নতুন পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম লাগাতে - - - -

ফি বছর গাড়ি বারান্দার অন্য কোণে
চুপি চুপি গরাদে চোখ রাখি দেখতে
বড়মার কাছে শোনা
মায়ের মেয়েবেলার প্রথম ও একক কবিতাপ্রেরকের বাড়ি - - - -
পাব কি আবার সাবেকি ভঙ্গিমায়
গত প্রজন্মের সেই মুগ্ধ প্রশ্রয়
যখন কবেকার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে
স্নান সেরে বারান্দায় চুল শুকোতে শুকোতে
Shakespeare আওড়ায় ....
"Tomorrow, tomorrow and tomorrow
creeps on this petty pace day by day....
if all our tomorrows were yesterdays....."

উঃ ! ফি বছর পুজোর পর
হিম হেমন্তে মেয়ের আধুনিক কবিতা
মায়ের সেই Shakespearan tragedy-র সুর-এ সরবিদ্ধ কি ?

নাকি গাড়ি বারান্দার পাশের তন্বী কৃষ্ণচূড়া, জামরুল গাছ
অধুনা সংসারি শাখা প্রশাখা নিয়ে ঢুকে পড়েছে বারান্দায়
শুঁয়োপোকারা তাই সেখান থেকে সার বেঁধে এসে সরবিদ্ধ করে
স্মৃতিরা নয় ?

ফি বছর পুজোর পর
এই হিম হেমন্তে
আলোআঁধারের প্রাপ্ত অবলেপে
ঝরাপাতার কারুকার্যময় ছায়াশরীর সব - - - -

আবার কবিতা

তাই কি - - - -

Indrani Mondal studied in Calcutta and Jadavpur Universities, India, and holds a PhD in Philosophy and Social Studies. A freelance writer in both English and Bengali, over the last decade Indrani has written fiction, nonfiction and poetry mainly on social and cultural issues facing immigrants and has published three books of poetry “Fugitive Wings”, “Pratidin Sati Hoi” and “Raater Sarir”. She is an active member of the Chicago Creative Circle, Unmesh and is the current coeditor of a bilingual online newsletter.

প্রতিবেশিনী

আনন্দ সেন, Ann Arbor

গলির মোড়ে হ্যালো
আজ রোদ উঠেছে ভালো
এক গুছি চুল মাঝ কপালে
আড়ালে টিপ ছিল ।

কোন দুপুর বেলার শীতে
হয়তো পাড়ার সি সি ডি তে
কেমন আছেন, ভাল তো সব —
হঠাৎ অতর্কিতে ।

হয়তো আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েন
নারীমুক্তির বিষয় নিয়ে লড়েন
আবার মন খারাপের বিকেলবেলায়
কৌশিকিতে মরেন ।

আকাশ যদি জলজ আশায় ভরে
আপনারও তো খুব ইচ্ছে করে
ছাদে উঠে বৃষ্টি নামাই
মেঘেদের বুক চিরে ।

কোন রাত্রি জাগার শেষে
ভোরের আলো হঠাৎ যখন সম্ভাবনায় মেশে
আপনিও কি দাঁড়ান সেদিন
জানলার পাশ ঘেঁষে ?

আপনিও কি ঋত্বিক আর ঋতুপর্ণ চাখেন ?
বুক ফেয়ারের বইয়ের গন্ধ মাখেন ?
মাঝে মাঝে একলা ঘরে
হৃদয়ে চোখ রাখেন ?

আপনার কি রঙতুলিতে প্রকাশ
নাকি সেতার হাতে ভাঙেন হিসাবনিকাশ
বা কথার ঘেরে খাতার পাতায়
বন্দী করেন আকাশ ?

আপনি হয়তো ফুচকা ভালবাসেন
তারাপদর চুটকি পড়ে হাসেন
আর মাঝে মাঝে মেঘলা হলে
জয় গোঁসাইয়ে ভাসেন ।

এসব কথা হয়নি আমার জানা
জানতে গেলে হাজার রকম না না
আমরা থাকি দু সংসারে
গন্ডী আছে টানা ।

তারচেয়ে এই ভাল
গলির মোড়েই হ্যালো
একটু হেসে বলব না হয়
উফ্ কাল কী বৃষ্টিটাই না হল ।

Ananda Sen is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abrho keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

ফেরার পথে

মানস ঘোষ, Kolkata

বরফ জমাট মসৃণ সাজঘর ।
ভাঙা আয়নায় খন্ডিত প্রতিরূপ ।
ঘুণধরা সিঁড়ি মঞ্চে গিয়েছে উঠে,
যেখানে কবর কাঁটাবনে নিশ্চুপ ।

মঞ্চে লুটায় ধূসর আলোকপাত ।
সমাধির পরে সুচারু পাথর ফলক,
খোদাই কবিতা তোমার জীবনকাল ।
এখনো বিরহে কাঁপে কি বিদেহী পলক ?

এই মরুভূমি একদা গোলাপ বাগান,
কবিতা, তোমার উচ্ছল রূপটানে ।
বিরহ প্রেমের মেঘ-রোদ লুকোচুরি,
ফুটে উঠে ঝরা এখনো পড়ে কি মনে ?

কবিতা ঘুমাও, আমি যাই তবে আজ ।
যবনিকাধারে আঁধার হয়েছে গাঢ় ।
শুরু হবে মাপা শব্দের রুটমার্চ,
সামনের দিকে ক্রমশ পিছোব আরো ।

বিদায় কবিতা ।
কবিতা, রেখোনা মনে,
ধুলোমাটি মাখা নিথর এ কাঁটাবনে ।

মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

কবিতা – মুখবন্ধ

শুভ্র দাস, ক্যান্টন, মিশিগান

যত বলি কবিতাটা আলোতে তুলে দেখ,
ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা
ধূসর স্লাইড ছবির মত;
কিংবা শোন্ বর্ষার রাতে হঠাৎ শোনা, মন কেমন করা
অচেনা সুরের মত;

যত বলি,কবিতার ল্যাবরেটরিতে ছেড়ে দে একটি ছোট ইঁদুর
দেখ কেমন করে অলি গলি ঘুরে পালানোর পথ খুঁজতে গিয়ে
অচেনা কোণে সে খুঁজে পায় আটকে থাকার মণি রত্ন

তারপর সাহস করে নিজেই ঢুকে পড় কবিতার ঘরে
এবড়ো খেবড়ো দেয়ালের সুখ দুঃখের ওপর হাত বুলিয়ে খুঁজে নে আলোর সুইচ;
কিংবা যিশু-কৃষ্ণ'র মত সদর্পে কবিতার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে যেতে
হাত নেড়ে চমকে দে পাড়ে বসে থাকা কবিকে

কিন্তু ওরা শোনে না,
কেবল কবিতাকে আষ্টে পৃষ্টে
চেয়ার এর সঙ্গে বেঁধে, ভয় দেখিয়ে,
চায় স্বীকারোক্তি;
তাকে ধরে, মেরে, টুঁটি টিপে কেবল জানতে চায়
তার মনের গোপন কথা ।

Original English poem "Introduction to Poetry" by Billy Collins

কবিতা

শুভ্র দাস, ক্যান্টন, মিশিগান

আর সেই তখনই . . . . কবিতা এসেছিলো,
আমার খোঁজে । জানি না কোথা হতে এলো সে
শীতের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় পর্দা সরিয়ে,
নাকি শান্ত নদীর কূল বেয়ে,
জানি না –
কানে বাজে নি কোনো কণ্ঠ, শুনি নি
তার কথা – অথচ সে নিঃশব্দে
ডেকেছে আমায়, পথের ওপার হতে,
গাঢ় অন্ধকারের ডালপালার আড়ালে,
হঠাৎ অগুণতি মানুষের মাঝে, হাতছানি দিয়েছে
আগুনের অজস্র শিখার মতো কখনো,
কখনো একা – মুর্তিহীন সঙ্গ তার স্পর্শ করেছে আমায় ।

ছিলাম অবোধ, অনুভূতির ছিল না ভাষা,
দৃষ্টিহীনের মতো খুঁজে ফিরেছি, কথা,
আত্মায় সেই স্পর্শ –
জানি না সে কি জ্বালা, নাকি হঠাৎ ফিরে পাওয়া
কোনো ডানা, যার ভরে
অন্ধকারেই পথ পেয়েছি ভাষার;
অনুভূতির সেই আগুনের পেয়েছি উত্তাপ ।
কাঁপা কাঁপা হাতে লিখেছি প্রথম অক্ষর
ক্ষীণ, অর্থহীন, নিরক্ষর'এর প্রথম লেখনী ।

আর ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই যেন
উন্মুক্ত হয়েছে গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা,
থরথর করে কেঁপে উঠেছে গাছপালা, অন্ধকার ছেদ
করে জেগে উঠেছে অজস্র আলো –
তীরের ফলা যেন সব, আগুনের অজস্র ফুলকি,
প্রস্ফুটিত এক গুচ্ছ ফুল;
এ যেন এক নতুন জগৎ ।

আর আমি, এই ক্ষুদ্র, নগণ্য, নশ্বর দেহে
পান করেছি সেই অসীমকে,
একাত্ম হয়েছি মহাশূন্যের অজানায়,
নক্ষত্রের গতিপথে চলেছি ধেয়ে –
দমকা হাওয়ায় ভেসে গিয়েছে আমার মন ।

Original poem "Poetry" by Pablo Neruda

হ্যানসেল

ইন্দ্রাণী দত্ত, Sydney

তোর কাছে এসেছি
আগুন জ্বালাবো বলে
চক মকি পাথর গুলি
দু'পকেট ভরে নিয়ে
রাস্তায় দিয়েছি ছড়িয়ে
ছেঁড়া রুটি গুঁড়োগুঁড়ো
পাখি সব উড়ে এসে
খেয়ে যাক
কোনো চিহ্ন যেন না থাকে –

আগুন নিভে গেলে
ছাই গাদায় কুকুর কুন্ডলী
রোঁয়া ওঠা ধুলো বালি
ছেঁড়া কম্বল
ভঙ্গুর মাটির ভাঁড়ে পিপাসার জল –

ফিরে যাব বলে তো আসিনি এখানে ।

আল্ট্রা ভায়োলেট

ইন্দ্রাণী দত্ত, Sydney

সূর্যের হাত খুব লম্বা
আকাশ থেকে ছুঁয়ে দিচ্ছে
তোমার বারান্দা, ক্যাকটাস, বসবার মোড়া, এলোচুল –
তোমার বুকের ওপর শুধু ছায়াটুকু –

তুমি রেলিং এ হাত রেখে –
ঘাড় ঝুঁকিয়ে ডাকলে – জিমিজনিগ্লসিফ্লসিইইই –
তোমার প্রশ্রয় টুকু বুঝে নিয়ে
সরলরেখায় রোদ নামল তোমার গলায়, চিবুকে –

তারপর ঠোঁট ছুঁতে গিয়ে দেখলো
তোমার হাত বাইছে একবিন্দু পিঁপড়ে –
কালো ও তুমুল আলাভোলা –

তোমার শরীর ভরা রোদ পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ছায়ায়

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান । শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয় । পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন ।

কুসুমের মাস

ইন্দ্রাণী দত্ত, Sydney

রূপ কথা
শেষ হয়
এবারের মত
পুনরায়
প্রতীক্ষাকাল
যদিও ফেব্রুয়ারি
বসন্ত জাগ্রত —

তথাপি
সিনান শেষে
আবহমান
এলো চুল রোদ ব্যালকনি
সকাল
কুয়াশাঘন
বিষাদ বাষ্পে
তবু গ্লিসারিনই
পৌঁছয়
ঠোঁট ছুঁয়ে
কমলা কোয়ায় ।

বইমেলা
সহসা যেন
অগম বিজন
রাতের শিশির স্নানে
মরে আছে
শেষ দুটি
বেগুনী কাঞ্চন ।

অস্থির দুপুর
জুড়ে
কবুতর ডাক —
খড়খড়ি
আলো ছায়া
বাতাস অলীক
স্পর্শকরে
ক্যালেনডার স্থবির
অন্তহীন জানুয়ারি
নির্বাসনে যায়
আধোঘুমে
জেগে থাকে মাস ডিসেম্বর ।

প্রবন্ধ

‘‘আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না’’

দেবীপ্রিয়া রায়, Chicago

প্রাক্‌কথন — ‘বাজারে বইটার আর একখানাও কপি নেই রে ! প্রকাশকের ঘর থেকে ছেপে আসতে আসতে লোকে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বুঝলি । খগাদাকে মনে আছে ? ছেলেবেলায় ইস্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ করে সেই যে সঞ্চয়িতা মুড়ে তাকে তুলে রেখেছিল, তার পর থেকে পাড়ার ফাংশানে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নাচিয়ে মেয়েদের উপর খবরদারি করা আর সিনেমায় শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীত গুনগুন করা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই বিরক্ত হয়ে যেত, খগাদাও এখন রবীন্দ্রবিশারদ । আমাকে ডেকে বলল,‘ছিঃ এই লোকটাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ! ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খেয়েছে আর ন্যাকামি করে গেছে — ভাব দেখিয়েছে যেন কত্ত পবিত্র ! বেঁচে নেই তাই, না হলে ও বুড়োকে শিক্ষা দিয়ে হাতের সুখ করে নিতাম ।’ মিঠু, এরা কোন রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন রে ? একলা পেয়ে বৌদির সাথে ফস্টিনস্টি করে কেটে পড়া বখা দেওর, কিশোরী ভাইঝিকে নিয়ে রোম্যান্স করা কাকা আর বাষট্টি বছর বয়সে পাহাড়ি রাস্তায় মুগ্ধা কিশোরী পাঠিকার গায়ে হাত দিয়ে আদর করে তারপর আরেক জায়গায় তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে বিদায় করে দেওয়া — এই মোটা রুচির, রীতিমত ভণ্ড লোকটা — এই রবীন্দ্রনাথ কে ? একে তো আমি চিনিনা । এই কবির হাত ধরেই কি আমি জীবনের সমস্ত সিংহদরজা পেরিয়ে এলাম ? আনন্দে বিষাদে প্রেমে পূজায় এই কবিই কি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমার নাড়ীতে নাড়ীতে আকাশ ভরা সূর্যতারার গান বাজে, আমার দেহমনের সুদূরপারে মুক্তির আহ্বান হাতছানি দিয়ে যায় ? আমার সেই রবীন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন ? তাঁকে হারিয়ে আমি কি করে পথ চলবো ?’ টেলিফোনের ওপারে গলা ধরে এলো আমার থেকে সামান্য বড় আমার দিদির । কি বলব বুঝে না পেয়ে খানিক্‌ চুপ করে রইলাম, তার পর বললাম, ‘কেন, এরা যে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকছে, সেইটাই বা সত্যি হবে কেন ? হয়তো এরা তাঁকে সবটা বুঝতে পারেনি, কিম্বা হয়তো বুঝেছে, কিন্তু সে বোঝাটা হয়েছে তাদের নিজেদের মাপদন্ডে, তাই ওদের সাথে তোমার মিলছে না । জল তোলার ঘটটা ছোট্ট বলে নদী থেকে কেউ মোটে এক ছোট্ট ঘড়া জল নিয়ে এলো, তাই বলে কি নদীতে কেবল ঐটুকুই জল ?’ ‘তাহলে তুই লেখ আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথের কথা ।’ ‘আমি ? কিন্তু আমার ঘটটিই বা বড় কই ? তাঁকে বুঝতে যে মস্তবড় আকাশটাও ছোট্ট হয়ে যায় !’ ‘যায়, যাক্‌ গে — তবু তুই লেখ্‌ । এদের এই অনেক অনেক মোটা কালো দাগে আঁকা ছবির মাঝে আমাদের আঁকাবাঁকা দাগে ভরা কাঁচা ছবিখানাও থেকে যাক্‌ ।’ লিখবো ? তাইতো — তাহলে তো ভাবতে হয় কবে প্রথম তিনি বুকের মাঝে সত্যিকারের ঘা দিলেন ।

কুমু ও লাবণ্য

বারো বছর বয়সের একলা মেঘলা দুপুরে আমি একা একা বসে ‘যোগাযোগ’ পড়ে ফেললাম । বৈঠকখানা ঘরের বইয়ের আলমারির মধ্যে থেকে একটা পুরনো বইয়ের মন ভালো করা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছিল আর জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া এসে আমার শ্যাম্পু করা চুলের মাঝে খুব গোলমাল করছিল । সেই সব অনুভূতির সাথে সাথে যোগাযোগের নায়িকা কুমুদিনীর হাত ধরে আমি সেদিন দুপুরে নারীত্বের বেদনা আর বিড়ম্বনা প্রথম বার বুকের মাঝে বুঝতে পেরেছিলাম । মনে আছে, বিকেলের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মা ছাত থেকে তখনও কাপড় তুলিনি বলে গজ্‌গজ্‌ করছিলেন — অথচ আমি সেদিকে মন না দিয়ে আপন মনে একটা কলম নিয়ে সেই হলদে হয়ে যাওয়া বইয়ের প্রথম পাতাটায় লিখছিলাম, ‘কুমুদিনী যেন গোলাপ ফুলের পাপড়িতে ভোরবেলাকার শিশির-স্বচ্ছ টলটলে ঘাসের আগায় দুলছে ।’ লেখাটার মাথা মুন্ডু কোন মানে ছিল না । আসলে আমার বারো বছরের মনের ভেতর একটা এমন উথাল পাথাল ঘটছিল যে কিছু একটা না লিখে আমি পারিনি ।

সদ্য কৈশোর পেরোনো সেইসব দিনগুলোতে মনের মাঝে বসন্তের আমের বোলের মত কুঁড়ি ধরেছে যেন — স্বপ্নের মত মাদকতা চারিধারে। ভালোবাসা কথাটা গানে শুনি, সিনেমায় দেখি কিন্তু মানেটা ভালো বুঝিনা। শাড়ি পরি তখন মাঝে মাঝে, রাস্তায় বেরুলে মোড়ের মাথায় পুরুষ নামক জাতিটির অল্পবয়স্কদের জট্‌লা দেখতে পেলে মুখ নামিয়ে নিই, জোরে হাঁটি, তাদের ভেসে আসা ঠাট্টা মস্করায় বুক ঢিপঢিপ করে, গাল লাল হয়ে ওঠে। গুরুজনেরা প্রায়ই 'এবার বিয়ে দিলেই তো হয়' বলে সস্নেহ রসিকতা করেন। নারীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে এর বেশী কিছু তখন জানি না। তবু বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে একজন নারী জাগছে, যাকে দেখে পুরুষের ভালো লাগছে বা লাগবে (তা সে রকে বসা ছোকরাও হতে পারে); একদিন শানাই বাজিয়ে সিঁথিমৌর হাতে আমি একজনের ঘর করতে যাব, সিঁদুর কপালে তার জন্য রান্না করব, গা ধুয়ে সিল্কের শাড়ি পরে তার সাথে বিকেলের শোয়ে সিনেমায় যাব। কখনও কখনও একটু ঝগড়া হবে আবার ভাব — মা, কাকিমা কিম্বা বৌদিদের দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরকম একটা ছবি তৈরী হচ্ছিল মনে মনে। সেই যে একজন, যাকে আশ্রয় করে লতাটির মত জড়িয়ে যাব — তার অপেক্ষা দানা বাঁধছিল কোন গোপন কোণায়।।!

বাদ্‌লা দিনের সেই দুপুরে কুমুদিনীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, ভালবাসার অনেক উপরে একটা অতীন্দ্রিয় মাত্রা আছে। সেই মাত্রার সন্ধান যে পেলনা আর যে পেল, তারা একে অন্যকে সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও খুঁজে পায়না। অভিজাত ও পড়ন্ত বনেদী ঘরের মেয়ে কুমুদিনী ছোটবেলা থেকে শিবপুজো করেছে। সেই থেকেই সে মনের মাঝে স্থির জেনেছে যে যেই তার স্বামী হোক্ না কেন, সে তাকে শিবের প্রিয়া সতীর মতই ভালোবাসতে পারবে। জমিদারঘরের মেয়ে সে। তার বাবা আর মা একে অপরকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাহলেও সে দেখেছে যে তার বাবা জমিদার বংশের রীতি মেনে বজ্‌রার উপর বাইজী নাচ দেখে রাত কাটাচ্ছেন; যার প্রতিবাদে শেষে তার অভিমানিনী মা অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা যান, আর তার অনুতপ্ত বাবা মদের ঘোরে ডুবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনেন। বাপের শেষ শয্যায় কুমু তাঁকে নিজের হাতে সেবা করেছে, আর সেই অভিজ্ঞতায় তার বাবা মায়ের ভালোবাসার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা গভীর হয়েছে। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ভালবাসায় তার এমনি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যে সে ভেবে নিয়েছে যে বিবাহটা জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। বাহ্য জীবনের ওঠাপড়ায় স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ক্ষুন্ন হয় না। ঠিক এই কারণেই তাদের প্রতিপক্ষ বংশের মধুসূদন যখন বেনেগিরি করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে শুধু হারানো প্রতিপত্তির শোধ তুলতেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়, তখন তার মনে মধুসূদনের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগেনি। বিয়ের প্রস্তাবে মত দিতে তার একটুও দ্বিধা হয়নি, প্রথম দিনটি থেকে সে মধুসূদন-এর কাছে মনে মনে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছে। সদ্য কৈশোরে সে তখন তার নিষ্পাপ সরল মন দিয়ে প্রেমের অপেক্ষায় আছে — পূজার মধ্যে, গানের মধ্যে, ভোরের প্রথম সূর্যের আলোয় সে যেন তার দয়িতেরই দেখা পায়। পাড়ার বাগ্‌দীবুড়ি যখন এসে বলেছে, 'হ্যাঁগা আমাদের কুমুর এ কেমন বিয়ে হচ্ছে? সেই যে কথায় আছে

এক যে আছে কুকুরচাটা শেয়াল কাঁটার বন

কেটে করলে সিংহাসন'

কুমু তখন সেখান থেকে সরে গিয়ে বাগানে একলা বসে থেকেছে, ফুল তুলে নিজের ঠাকুরকে দিয়ে বলেছে মনে মনে 'তোমাকে দিলাম।'

কুমুকে পরম যত্নে আর আদরে মানুষ করেছেন তার পিতৃসম দাদা বিপ্রদাস — শিখিয়েছেন তাকে সংস্কৃত সাহিত্য আর ধ্রুপদী সঙ্গীত। দাদা জানতেন ও বুঝতেন যে বেনেবৃত্তি করা স্বামীর সাথে কুমুর সূক্ষ্মরুচি নাও মিলতে পারে; তাঁর আশঙ্কা আর সাবধানবাণী তুচ্ছ করে সে মধুসূদনের গৃহিণী হয়েছে। কিন্তু তারপর মধুসূদনের সাথে প্রথম রাত্রি কাটিয়ে ভোরবেলায় সে যখন উঠে এসেছে, তখন তার চোখ লাল, মনে হচ্ছে সে অশুচি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে খুব ছোট শিশুকে হঠাৎ মারলে পরে যেমন সে অবুঝ অভিমানে ফুঁপিয়ে অবাক হয়ে যায়, কুমুর যেন সেই দশা। মধুসূদনের স্থূল রুচি আর কদর্য রূঢ়তাকে মনের ভিতর থেকে গ্রহণ না করতে পেরে শুধু শরীরের অধিকার দিতে হওয়ায়, সে ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে কেবলই গেয়েছে, 'বাঁশরি হমারি রে' — ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর কেন ভরে উঠছে না?' সে তার স্বামীর কাছে আপনাকে

উজাড় করে নিবেদন করতে চায়, সে ভালবাসতে চায়, কিন্তু তার নিবেদনকে নিজের স্থূলতায় মধুসূদন পঙ্কিল করে ফেলছে। আর মধুসূদন ? অনায়াস অধিকারে যে মেয়েকে সে ঘরে এনেছে, পৌরুষের দম্ভ দেখিয়ে শয্যায় পেয়েছে, তার কি যেন তার হাতের বাইরে রয়ে গেছে — সেই ক্ষোভে সে অস্থির হয়ে যাচ্ছে — কুমুকে সে কখনও গহনার লোভ দেখাচ্ছে, কখনও তার বাপের বাড়ির বংশের অপেক্ষাকৃত দৈন্য নিয়ে ঠেস দিচ্ছে, তবু তাকে সে স্পর্শ করতে পারছে না। অজস্র দামী শাড়ি ফেলে যখন কুমু একটি সাধাসিধা শাড়ি পরে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার মনে হচ্ছে কুমুর কালো ডুরে শাড়ির কালো কালো ডোরা যেন ঝর্ণার মত তাকে ঘিরে রয়েছে — আর তাই সে মনে মনে বলছে, 'হায় রে সে মেয়ে কত দূর !' যত এই নাগাল না পাওয়া, ততই বেড়ে উঠছে তার বিদ্রূপ আর অত্যাচার ! শরীরের দাবী মেটাতে সে তার বিধবা বৌদিদিকে শয্যায় এনেছে, তবু কুমুর উপর নিজের দাবী ছাড়েনি। নারী জীবনের এই বিড়ম্বনা — একই ঘরে একই ছাদের তলায় থেকেও এই অসহায় বঞ্চনার বোঝা বওয়া, — কেমন করে কুমু সে বোঝা বয়েছিল — সে কথা রবীন্দ্রনাথ লেখেননি, শুধু বলেছেন যে কুমু এই বন্ধন ছিঁড়তে চেয়েও পারেনি সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায় সে মধুসূদনের সাথে চিরকালের মত বাঁধা পড়ে যায়। এই বাঁধা পড়ায় মধুসূদনের সংসারে যারা কুমুকে ভালোবাসতো, যারা এতোদিন মধুসূদনের হাতে তার অবমাননার ঘটনায় বিচলিত ছিল, তারাও খুশী হয়, কারণ এটাই জগৎ সংসারের নিয়ম — মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের সম্পত্তি মাত্র, এবং সন্তান ধারণ করেই মেয়েরা নিজেদের জায়গা পাকা করে নেয়। কুমুর এই পরিণতিতে দুঃখ পায় একমাত্র তার দাদা বিপ্রদাস।

কিশোরী সেই আমি প্রথম জানলাম যে ভালবাসা মানে শুধু সিঁথেয় সিঁদুর দেওয়া নয়, হাত ধরাধরি করে সিনেমায় যাওয়া, গয়নার উপহার পেয়ে ছলছল করা নয়। এর মাঝে এক জাদুকাঠি আছে, যাকে ধরাছোঁয়া যায় না, অথচ সেই সবকিছুকে সার্থক করে তোলে। কি সে জাদুকাঠি ? সেই জাদুকাঠি বোধহয় অন্তরের মিল - মানসিকতার মিল। জ্যোতিষীর রাজযোটকে সে মিলের খোঁজ থাকেনা সে মিল যেখানে ঘটে সেখানে দৃষ্টি চলেনা। সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ জন জ্যোতিষী মিলে পাঁজিপুঁথি মিলিয়েও তাকে ধরতে পারেন না। একেই বোধহয় বলে অতীন্দ্রিয়, এর সন্ধান রবীন্দ্রনাথ যেমন করে জানতেন, তেমন বোধহয় আর কেউ জানে না, এবং এই অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান না পেয়েও যখন একে অপরকে ঘানির বলদের মতন জুড়ে দেওয়া হয়, তখনকার বেদনাও বোধহয় তাঁর মতন আর কেউ কখনও অনুভব করতে পারেনি। 'মানুষে মানুষে যে ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদান গুলো অনেকসময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায় ইঙ্গিতে ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারা, যখন কিছুই করছেনা তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে রুচিতে, রীতিতে জীবনযাত্রার আদর্শে ভেদের লক্ষণগুলি ছড়িয়ে থাকে — মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এক বিপুল আবর্জনার মত চারিদিকে জমে উঠেছে।' রুচির মিল, সহমর্মিতা নাহলে ভালবাসা জন্মায় না। ঐশ্বর্য, রূপ লাবণ্য, বংশমর্যাদা — রুচির মিল ছাড়া এসব বস্তু জীবনের গতি কেবল ব্যহত করে, আবিল করে। ভালবাসার সত্যিকারের সংজ্ঞায় কিশোরী আমার সেদিন সেই প্রথম পাঠ। যাদের যুগল জীবন এতদিন আমাকে শিহরিত করত, সচেতন ভাবে সেই জগতকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হল এই আবর্জনার সাথে ঘর করেই বেশীর ভাগ নারী পুরুষের জীবন যায়। বলা বাহুল্য, এই বোধটা খুব সহজে আসেনি। বারো বছরের মেয়ে হিন্দি সিনেমা দেখে রোমাঞ্চিত হবোনা, মাসিক পত্রের পাতায় প্রেমের গল্প লেখা পড়ে স্বপ্নালু হয়ে বসে থাকবো না — এতটা জীবনবোধ তখন গড়ে ওঠেনি। মীনাকুমারী আত্মত্যাগ করলে তখন কেঁদে ভাসাই, শাম্মী কাপুরের চুলে ঝাঁকি দিয়ে ইয়াহু চিৎকারে বুকের মধ্যে ঝাঁকুনি লাগে আর সৌমিত্র কিম্বা উত্তমকুমার গভীর গলায় নায়িকার উদ্দেশে ভালবাসার কথা বললে মনে হয়, 'ইস্ এ তো আমাকেই বলা হল।' কিন্তু যোগাযোগের কুমুকে ভুলতে পারিনা। চৌদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রজয়ন্তীর জন্য রিহার্সাল দিতে বসে গান শুনলাম, 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ — তোমারই মুখ ঐ নেমেছে চোখে আমার চোখ থুয়েছে — আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমার চরণ' — আর আমার চোখে জল জমে ওঠে। কে এই হৃদয়হরণ ? বুঝিনা ! কি রকম তাঁর প্রেম বুঝিনা, শুধু তাঁর চরণ দুখানি ছুঁতে ইচ্ছা হয়। গলির মোড়ে, সিনেমার পর্দায়, পূজা উপন্যাসের পাতায় এঁকে দেখতে পাইনা। প্রেম বা ভালবাসা সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা ভাব জেগে ওঠে, কি যে তার নাম তা ভাষায় বলা কঠিন — ভোরবেলাকার সুরে সোনালী আলোয় ভেসে আসা গানের রেশের মত তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। গান শুনি, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে — আমায় কেন বসিয়ে রাখ একলা দ্বারের পাশে' — আর বুকের মধ্যে নালিশ

জমে — কার উদ্দেশ্যে তাও বুঝিনা। কুমুকে এঁরই কাছে নালিশ করেছিল — 'বাঁশরি হমারি রে ?' আমার মাঝে তোমার সুর কেন বাজছে না ? রবীন্দ্রনাথ আমার সীমিত জগতে অসীম প্রেমের ইশারা জাগিয়ে দেন। মনে হয়, এই সেই ভালবাসা — শরীরি হয়েও অশরীরি — অসীম আর সীমিতের এখানে হাতধরাধরি — দুটি ভিন্নব্যক্তির রুচি আর মানসিকতাকে যা মিলিয়ে দেয়। যারা এই মিল খুঁজে পেল, তাদের নিত্যকার জীবনে বাঁধাধরা সীমার মাঝে হৃদয়হরণ অসীমের চরণস্পর্শ নেমে এল, রোজকার ঘরকরণার কাজেই বাজল তাদের অসীমের ছন্দ।

সেদিন যেটা বুঝিনি আর আজ যেটা বুঝি সেটা হল যে কে এই স্পর্শ পেল, কে পেল না — এর খতিয়ান শুধু সে নিজেই জানে। রেঁধেবেড়ে, সন্তানকে পোক্ত করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, বসতবাটির ব্যবস্থা করে যে পৃথিবী ছেড়ে গেল, তাকে সবাই বলে, 'দিব্যি সুখে সংসার করে গেল।' তার জীবনে সীমার মাঝে সেই অসীমের সুর তার বাজল কি বাজল না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সেদিন তা বুঝিনি বলেই 'শেষের কবিতা' পড়ে আমার অস্বস্তি হয়েছিল। কেমন একটা অসমাপ্ত গল্প যেন ! সেই বয়সে নায়ক, নায়িকার মিলন বুঝি। কুমুর ব্যথাও হয়ত খানিক বুঝি, কারণ সেই যুগে, সেই সময়ে আমাদের চারপাশে পরিবার ও সমাজের শাসনের নিগড়ে অকারণে উৎপীড়িতা, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্না আত্মীয়া ও পরিচিতাদের দেখতে পেতাম অনেক সময়। আলাপ আলোচনা হত তাঁদের নিয়ে, যদিও কুমুর মতই তাঁরা সন্তানের বাঁধনে বাঁধা থাকতেন বলে সকলে তাঁদের 'ভাল' বলত। কিন্তু লাবণ্য ও অমিত রায় কেমন যেন ! ভালবাসল, বিয়েতে কোন বিঘ্নবিপদ নেই, তবু বিশাল এক কবিতা লিখে 'হে বন্ধু বিদায়' বলে এ ওকে ছেড়ে গেল। কবিতাগুলি বেশ সুন্দর কিন্তু কারণটা আমার কিছুতেই বোধগম্য হত না। বিশেষ করে লাবণ্য — তাকে আমার ভারী ন্যাকা মনে হত। অমিতকে 'ভালবেসে যে আমি মরতে পারি।' বলে যোগমায়ার কাছে কেঁদে ভাসাল, তবু গিয়ে শোভনলালকে বিয়ে করল। এতে শোভনলাল বেচারীর উপর কত অন্যায় হল, আর কেতকী ? সেও তো ন্যায় বিচার পেলনা। সিগারেট খেত, মুখে এনামেল করত তাতে কি ? অমিতকে ভালবেসে সে তো নিজেকে বদলে ফেলেছিল, আর অমিতও তো প্রথম কেতকীকেই ভালবেসেছিল, আংটি পরিয়ে দিয়েছিল তার হাতে। তবু কিনা শেষ অধ্যায়ে তাকে বিয়ে করেও বলা হল যে, সে কেবল নিত্য ব্যবহারের ঘড়ায় তোলা জল ? আর লাবণ্যকে বলা হল সাঁতার কাটার দীঘি ? মনে মনে এইসব তর্ক নিত্য করতাম রবীন্দ্রনাথের সাথে। অবশ্য এটা স্বীকার না করে পারতাম না যে কেতকীর জন্য ন্যায্য অধিকারের লড়াইটা লাবণ্য নিজেই করেছিল। সেই তো মনে করিয়ে দিয়েছিল অমিতকে যে তার অবহেলাতেই কেতকী কেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে — 'তোমার অনাদরে গড়া'। ভালবাসার পাত্রের কাছ হতে পাওয়া উপহাস মানুষকে নিজের কাছে ছোট করে আনে, বদলে দেয় — এ শিক্ষাটা লাবণ্যই দিয়েছিল, তাকে ন্যাকা বলি বা যাই বলি !

বয়স বাড়তে বাড়তে মনের চেহারা পাল্টে যায় — এখন মীনাকুমারীর কান্না দেখে বিরক্তি আসে, ভাবি কেন রে বাপু ? ঐ একটা বোকারাম হতচ্ছাড়ার প্রেমে এত উথালি পাথালি হওয়ার আছেটা কি ? এমনকি রূপালী পর্দার নায়কের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে এমন কথাও ভাবি যে, 'আচ্ছা নায়কেরা সবরকম নায়িকাকে একসুরে এক চাউনি দিয়ে প্রেম নিবেদন করে যান কি করে ?' এমনি করেই জীবনের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে এগিয়ে যাই — বুকের মধ্যে হাল ধরে রন্ — রবীন্দ্রনাথ। সকল ওঠা, পড়া কান্না হাসির মাঝে তিনি চিরহরিৎ, চিরনবীন কান্ডারী, তিনি 'আমার আত্মার আরাম'। সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে তাঁর কবিতা বুকের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠে বলে — 'ওহে অন্তরতম — মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম ?' কাকে বলি এ কথা ? কোন ব্যক্তি বিশেষকে বলিনা — শুধু যখন নির্জনে নিজের সাথে দেখা হয়, তখন এই কথা মনে বাজে। মন বলে সেই অসীম, সেই হৃদয়হরণ — তাঁরই জন্য আমার সকল লয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, তাঁর সাথে মিলন হবে বলে 'হৃদয় আমার বধূর বেশে চলে।'

তাহলে কি ব্যক্তিবিশেষের জন্য এতদিনের এত যে প্রেমের কথা ভেবে এলাম, সে সব মিথ্যা ? তাও তো নয়। আমার দৈনন্দিন সংসার, আমার সীমিত জগতের সেটাই তো সত্যি, কিন্তু তারও পরে কোন্ এক অদৃশ্য হাতছানি আসে। কে দেয় সে হাতছানি ? সে কি ঈশ্বর ? তাই কি পূজা পর্যায়ের কবিতায় আমি তাঁর প্রেমের ছায়া দেখতে পাই ? কেন মনে হয় সেটাই আসল প্রেম। তবে কি প্রেম নৈর্ব্যক্তিক ? ব্যক্তিমানুষকে কি সত্যকারের ভালবাসা যায়না ?

এইবার আবার 'শেষের কবিতা' খুলে বসি । এবার চোখে পড়ে যে কথা মন দিয়ে দেখিনি এতদিন । অমিত যখন লাবণ্যকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, লাবণ্য উত্তর দেয়, 'তোমার কাছে ওটা শাস্ত্রের দোহাই — পাড়া সেইসব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সাথে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে ।' পড়তে গিয়ে আমার অনেকদিন বাদে কুমুর কথা মনে পড়ল, মনে হল এই কথাক'টি কুমু ও মধুসূদনের বর্ণনা — এমন এক যুগল জীবনের কথা, যেখানে বন্ধন আছে, ভালবাসা কোথাও নেই । এরই বিরুদ্ধে কুমু বিদ্রোহ করেছিল । অর্থাৎ এক যুগের ওপারে প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধে কুমু যে কথা মনে ভেবেছিল, মুখে বলতে পারেনি, লাবণ্য সেই কথা পরিষ্কার করে বলতে পারছে । সে বলতে পারছে যে ভালবাসার পাত্রের কাছ হতে অনাদর পেলে মানুষ নিজের কাছে নিজের মূল্য হারিয়ে ফেলে । কিন্তু সেই সাথে সে একথাও বলতে পারছে যে বিয়েটা ভালবাসার আগমার্ক নয় । বলতে পারছে যে বিয়ে মানে মৌরসী পাট্টা পেয়ে যাওয়া নয় । যদি কেউ তা ভাবে, তাহলে বিয়ের আসল অর্থ যায় হারিয়ে । কথাগুলো শুনতে সহজ অথচ মেনে নেওয়া কঠিন । কিন্তু শুধু এটুকু বলেই লাবণ্য ক্ষান্ত থাকেনি । সে এযুগের মেয়ে, কুমুর মতন সংস্কৃত পড়ে আর শিবপূজা করে সে বড় হয়নি । সে খোলা মনে সহজ চিন্তা করতে পারে আর সেই জন্যই সে কুমুর থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে । যে অমিতকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, নিজের প্রতি তারই মুগ্ধতাকে বিশ্লেষণ করে অমিতকে বলছে যে অমিত লাবণ্যকে ভালবাসেনা, ভালবাসে নিজের সৃষ্ট একটি মূর্তিকে । খুব বেশি নৈকট্য হলে প্রাত্যহিকতার ঘষামাজায় সেই মূর্তির রং যাবে চটে । কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়, কারণ অমিত যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনায় মশগুল, তখনও ঠাট্টাছলে হলেও নিজেদের মধ্যে খানিক ব্যবধান রেখে দেওয়ার কথা ভেবেছে । সে ব্যবধান, কখনো বা সাঁকো, কখনো বা একই ঘরে আলনার এপার আর ওপার । কিন্তু লাবণ্যের মুখ থেকে এ কথা অমিত মেনে নিতে পারেনি । সে লাবণ্যের বুদ্ধির দীপ্তিকে প্রশংসা করে বলছে বটে 'তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয় —

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে

মিলিত ছবি

তাই নিয়ে আজি পরাণে আমার মেতেছে কবি —

— তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে নিজেরে চিনি ।' (নির্ঝরিণী — শেষের কবিতা)

কিন্তু লাবণ্য চলে যাওয়ার পরে সে অমিতই আবার নিজের মনেই বলছে, 'লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্ত স্পষ্ট করে জানতে চায় । — এইখানেই কি মেয়ে পুরুষের ভেদ । পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সে সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যই আপনাকে পদে পদে ভোলে ।' অর্থাৎ পুরাতন সৃষ্টিকে ভুলে না গেলে নতুনের দিকে এগোনো যায় না, তাই পুরুষ নিজের সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় আর 'মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে — এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই — তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি ।'

পড়তে পড়তে চমক লাগল — সত্যিই তো তাই । ভালবেসে সকল দুয়ার জানলা শক্ত আগলে বেঁধে রাখলে সে ভালবাসা তো দম আটকে মারা পড়বে । সকল দুয়ার জানলা হাট করে মুক্তি না দিলে, নিজের ইচ্ছায় ভালবাসবো কি করে ? কিন্তু তাহলে উপায় কি ? নূতনের সৃষ্টি আর পুরাতনকে রক্ষা করে চলার মাঝেই তো সংসারের ধারাবাহিকতা — ভালবাসলে তো ধরে রাখতে ইচ্ছা হবেই আর তা করতে গেলে ভালবাসা পড়বে মারা । কুমু ধারাবাহিতা বজায় রাখতে রুচির পার্থক্য, মতের পার্থক্য সত্বেও ধরা দিয়েছিল, কিন্তু ভালবাসা দিতে পারেনি । লাবণ্য ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে মুক্তি দিয়ে চলে গেল । বার বছরের সুদূর কৈশোরে কুমুর যে বেদনা আমায় বেজেছিল তা এই মুক্তিকে হারিয়ে ফেলার বেদনা, তাই তাকে আমি বলেছিলাম গোলাপের পাপড়ির উপরে ক্ষণিকের শিশির । এই মুক্তি তাহলে সেই অসীমের ছোঁয়া — সেই হৃদয়হরণ প্রেম । সীমার মাঝে তাঁকে খুঁজে আমাদের জীবন যায় — বাউল গানের খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর মতন তিনি নিত্য যাওয়া আসা করেন । এই অসীমের আসা যাওয়ার কথাই কবি ঠাট্টা করে নির্মল কুমারী মহলানবীশের কাছে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'আমাদের সকলের মধ্যে একটা পাগল আছে, সে আমাদের সব লেখা ও ভাবার মধ্যে খেয়ালী রঙ মিশিয়ে দেয়, আমাদের

ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলোয়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের সুর লাগিয়ে বসে — জীবনের মধ্যে পাগলের খোঁচা এড়াতে পারলে বেশ ঠান্ডা হয়ে দিনে ঘুমিয়ে তাসপাশা খেলে নিরাপদভাবে সংসার যাত্রা করে নাতি নাতনির মুখ দেখে কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে আয়ুটিকে বায়ুর ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে চলা যেতে পারতো। সে আর হয়ে উঠলো না।' (বাইশে শ্রাবণ)

প্রশ্ন জাগে মনে — এই অসীমকে রবীন্দ্রনাথের মত কবি নিজের জীবনে কিভাবে অনুভব করেছিলেন ? তাঁর নিকট লোকেরা বলেন যে তাঁর নিজের মধ্যে একটা বিরাট নিরাসক্তি ছিল। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, 'তোমাদের অর্ঘ্য যদি আমাকেও পূর্ণ না করত, তবে আমি সময় নষ্ট করতে দিতাম কেন ? যেমন ফুলের সুগন্ধ, পরিচ্ছন্ন বাতাস ঈশ্বরের দান, তেমনি তাঁর দান মানুষের স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি। এই দান আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করেছি।' (স্বর্গের কাছাকাছি) আবার রাণি চন্দের লেখায় (গুরুদেব) পড়ি, কোন একটা জায়গায় তিনি সম্পূর্ণ একা দর্শকের ভূমিকায় থাকতেন দাঁড়িয়ে; দ্বন্দ, বিরোধ, কুৎসা, ঈর্ষা তাঁকে স্পর্শ করতো না। আসক্তি ও নিরাসক্তি — এই দুয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ, তাকে নীচে ফেলে, তার উপরে যাওয়ার সাধনা অবিরাম চলত তাঁর মনের মাঝে — 'পরিবর্ত্তনশীল সীমার জগৎকে আবৃত করে অসীম পরিপূর্ণতা বিরাজ করে। নিজের জীবনে এই কথাটাকে উপলব্ধি করাই জীবনের চরম সাধনা। অসীমের সঙ্গে সীমাকে আমরা পৃথক করে ফেলি যখনি আমরা নিজের প্রবৃত্তিকে একান্ত করে তুলি, যখন তাকে সম্পূর্ণের সুষমার অনুগত করে না দিতে পারি। — আমার কর্তব্যবুদ্ধিটা আসলে সৌন্দর্যবোধ। যখন বাইরের সাথে মন কলহ করতে উদ্যত হয়, তখন সেই ইতরতায় আমি নিজেকে অসুন্দর দেখি, তাতেই কষ্ট পাই। (বাইশে শ্রাবণ)।

এই সুন্দরকে আমাদের জীবনে চিরন্তন মুক্তির মাঝে বাঁচিয়ে রাখা, আমার চোখে এই হল রবীন্দ্রনাথের দেখানো ভালবাসার জাদুকাঠি। সৌন্দর্য আর মুক্তিকে, অনাবিল চিরন্তন ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার এই আকুল আরাধনা, এরই মূর্ত্ত প্রতীক আমার মনে কুমু আর লাবণ্য। কিশোরী বয়সে কুমু আমাকে এই আরাধনার সন্ধান দিয়েছিল, আজও চলেছে সন্ধান —

পরিশিষ্ট — 'লেখাটা ভাল হয়েছে, কিন্তু —' 'জানি, কিন্তু থাকবে, বলেছিলাম না তাঁর পরিমাপ করা আমার সাধ্যাতীত।' 'না আমি বলছি যে কুৎসাগুলির তো উত্তর দেওয়া হলো না।' 'দেখ, কুৎসার উত্তর দিতে গেলে কুৎসা রটনাকারীর পর্যায়ে নামতে হয়, না কি ? সে কি তোমার আমার কর্ম ? তবে কুৎসাগুলির কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে বল তো ? রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্মৃতিচারণ আর তার সাথে তাঁর বিভিন্ন বয়সে দুয়েকটি আত্মীয়ার সাথে তাঁর মানসিক সখ্যের কাহিনী আর তাঁকে ভক্তি করতেন, এমন একটি মহিলার লেখা কয়েকটি চিঠির শব্দ বিশ্লেষণের উপর। যাঁরা সে চিঠি লিখেছিলেন তাঁরা জীবিত থাকা কালীন এই নিয়ে (একমাত্র সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি' ছাড়া — স্বর্গের কাছাকাছি — মৈত্রেয়ী দেবী) বিশেষ নাড়া চাড়া হয়নি। হয়নি কেন জানো ? কারণ সেগুলি সেই সব মহিলাদের স্বীকারোক্তি ছিল না, ছিল কেবল তাঁদের সখ্যের বিবরণ, কিম্বা কাগজের মাধ্যমে কবির সাথে স্নেহে, কৌতুকে সমুজ্জ্বল ভাববিনিময়। পড়ে দেখ, তাতে কবির সাথে তাঁদের মানসিক সৌহার্দ্য ছাড়া আমিষগন্ধী কোন সৌহার্দ্যের চিহ্ন মাত্র নেই। সেদিনের পুরুষপ্রধান সমাজে কবির মতন সূক্ষ্ম অনুভুতিপ্রবণ মনের কাছে যে সদ্যজাগ্রত কিশোরী আত্মীয়ারা সুহৃদ খুঁজে পেতেন, সেটাকি খুব অস্বাভাবিক ? তবু আজকের গবেষক সেই সব চিঠি ও ভাসা ভাসা স্মৃতিচারণের উপর ভিত্তি করে বাজার চলতি বই লিখে ফেলছেন গরম গরম ! আর আমরা পাঠকেরা গোগ্রাসে সেগুলি পড়ে ফেলে স্ফূর্তির হাসি হাসছি, যে হাসিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন 'পাহারাওয়ালার চোর ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি'। রবীন্দ্রনাথ নামক যে লোকটা অতীন্দ্রিয় এক ভাবের কথা বলে, আমাদের কতদিন ধরে হীনমন্যতায় ভুগতে বাধ্য করেছে — হীনমন্য, কারণ আমরা তো সেকম কোন ভাব অনুভবই করছি না, সে আসলে ডুবে ডুবে জল খেয়েছে।

'কিন্তু কেন বল্ তো, মিঠু ? ঐ বইই কেন ভালো লাগবে সবার ? আমরা তো আরো কত বই পড়েছি ! কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন, এমন মহিলা ও পুরুষ তো ছিলেন কতজন। ছোটবেলায় আমাদের তাঁদের নাম মুখস্থ ছিল, মনে পড়ে ? মনে পড়ে সেই সব বই ? বাইশে শ্রাবণ — নির্মলকুমারী মহলানবীশ, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গের কাছাকাছি — মৈত্রেয়ী দেবী,

গুরুদেব, সব হতে আপন – রাণি চন্দ ? কি সহজ সুন্দর ভাষায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাথে দেশে বিদেশে ঘোরা, শান্তিনিকেতনে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায়, তাঁর পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা আর তাঁর কাছ হতে পাওয়া চিঠি সবকিছুকে গুছিয়ে সবিস্তারে লিখে গিয়েছেন। সেখানেই তো পড়েছিলাম যে, স্নেহশীল রবীন্দ্রনাথ খেতে বসে তাঁর পাতের চারপাশে সাজানো বাটি তুলে তুলে শান্তিনিকেতনের সকলকে পাঠিয়ে দিতেন। আবার মৈত্রেয়ী দেবী বা রাণী চন্দ দুইজনেই কবির কাছে শাসন পেয়ে অভিমানে যখন কেঁদে ভাসিয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ স্থির হয়ে বসে তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছেন, বুকের কাছে টেনে নিয়েছেন। সেই সব 'আদর' নিয়ে তো গবেষণা হয়নি !' 'তার কারণ গবেষণা করার ছিল না কিছুই। সবটাই ছিল জানা – সহজ সরল। কিন্তু ঘটনাচক্রে যাঁরা সেই সব ঘটনা নিয়ে লেখেন নি, তাঁদের নিয়ে গবেষণা করে কুৎসা ফেনিয়ে তোলাতে আনন্দ আছে ! শোনো বলি – ও কথা নিয়ে ভেবো না। যিনি আমাদের চারপাশে নিরন্তর বহে যাওয়া আনন্দধারার সন্ধান দিয়েছেন, ক্ষুদ্র দুঃখ ভুলে অঞ্জলি ভরে সে আনন্দকে পান করতে বলে গেছেন – তাঁর কথা মিথ্যা যেন না হয়। তিনি বলেছেন, 'আলোর মাঝে আমাদের সকলের মুক্তি'। কুমু সে মুক্তি খুঁজেছিল, লাবণ্য তাকে জীবনে পেতে অনেক মূল্য দিয়েছিল, সেই মুক্তির উত্তরাধিকার নিজের জীবনে খুঁজি চলো যাই।।।।।

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চ্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

"দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।
মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে,
বকুলশাখার চঞ্চলতায়
মর্মরে মর্মরে।"

প্রবন্ধ

বলো ভাই কী দাম দেবে ?

সুজয় দত্ত, Ohio

সেই কোন্ ছেলেবেলায় দেখা একটি বাংলা ছায়াছবিতে বাংলা সঙ্গীতজগতের এক অমর শিল্পীর গাওয়া 'পুতুল নেবে গো, পুতুল ?' গানটা সম্প্রতি এক বিরল অবসর-মুহূর্তে আমার সযত্নরক্ষিত আদ্যিকালের ক্যাসেট্ প্লেয়ারে শুনতে শুনতে ঐ লাইনটায় এসে থমকে গেলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ গন্ডীতেই হোক বা বিশ্বজগতের বৃহত্তর পরিসরে — ঐ প্রশ্নটার কোনো সহজ, সর্বসম্মত, নৈর্ব্যক্তিক উত্তর নেই।

ধরুন আপনার মেয়ের জন্য হীরের টুকরো পাত্র পেয়ে আপনি এতটাই আহ্লাদিত যে বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করতে নিজের বসতবাড়ীটা জলের দরে বেচে দিতেও আপত্তি নেই। এবার কল্পনা করুন, আপনাকে সাহারা মরুভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে একফোঁটা জল নেই, আছে শুধু কয়েকটা হীরের টুকরো। কেমন লাগবে ? বাংলাভাষায় 'হীরের টুকরো' আর 'জলের দর' উপমাদুটো যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল, ইচ্ছে করবে না তাদের মুন্ডুগুলো চিবিয়ে খেতে ? কল্পনার দরকার নেই, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা বা মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করুন, যাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার রূঢ় বাস্তবতাই হল 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে'। তারাই বলে দেবে জলের আসল দাম। তাহলে সেকথা অর্থনীতিবিদ্দের কানে ঢোকেনা কেন ? কেন অ্যান্ট্ওয়ার্পের জহুরীর হাতে কাটা হীরে কোটি কোটি টাকায় নিলাম হয় আর কলকাতার রাস্তায় কর্পোরেশনের প্যাঁচকাটা কল থেকে অবিরাম ধারায় জল পড়ে নষ্ট হলেও কারো ভ্রূক্ষেপ থাকেনা ? কারণ তাত্ত্বিকদের খাতায়-কলমে কোনো জিনিসের দাম নির্ধারণ করে সাপ্লাই-ডিম্যান্ড ইক্যুয়েশন। চাহিদা-সরবরাহের এই ঢেঁকুচ্কুচ্ খেলায় যে জিনিসের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম, তার দাম বাড়তেই থাকবে (যতক্ষণ না এই আকাশছোঁয়া দামই আবার ব্যুমেরাং হয়ে এসে তার চাহিদা কমিয়ে দেয়) আর যার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অঢেল, তার দামও ছোঁবে তলানি। যেমন সোনা আর লোহা। সুন্দরী ললনার দেহ, রাজাদের প্রাসাদ বা সিংহাসন আর দেবদেবীদের মন্দিরের চূড়ো আলো করে থাকা ছাড়া সোনা মানুষের আর কোন্ কাজে লাগে বলুন তো ? হ্যাঁ, হাতে গোনা কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় হয়তো লাগে। আর লোহা ? জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেখানে লোহার স্পর্শ নেই ? সান্ ফ্রান্সিস্কোর গোল্ডেন্ গেট ব্রিজটা যদি ইস্পাতের না হয়ে সত্যিই খাঁটি সোনার হতো, সমস্যায় পড়তে হতো নিত্যযাত্রীদের। ব্রিজ দুমড়ে বা ভেঙে অত উঁচু থেকে গাড়ী-টাড়ী শুদ্ধু জলে পড়ার অভিজ্ঞতাটা মোটেই সুখকর নয়। আপনার বহুতল বাড়ীর কাঠামোটা যদি ইস্পাত আর রিইন্ফোর্স্ড্ কংক্রীটের বদলে সোনা দিয়ে বানাতে চাইতেন, তাহলে সে-বাড়ীর আর বহুতল হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো হতো না। আর আপনার শিরায়-ধমনীতে যেটা বইছে তার রংই বা লাল কেন ? এসব ভাবলে কোনো দৃঢ়চরিত্রের পরোপকারী ছেলেকে 'সোনা ছেলে' না বলে 'লোহা ছেলে' বলতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু মুশকিল হল, এই পৃথিবীতে সোনা অতি দুর্লভ আর ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে লোহার অভাব নেই। ব্যস্, হয়ে গেল। আধভরি সোনার গয়না গড়াতে গেরস্তের ব্যাংক-ব্যালেন্স উজাড় হয়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে আকরিক লোহা বিকোচ্ছে টনপ্রতি বড়জোর কয়েক হাজার টাকায়। লোহা তো তবু কষ্ট করে ধরিত্রীর পাঁজর খুঁড়ে বার করে আনতে হয়। জলের বেলায় আবার সে-বালাইও নেই। আকাশ থেকে আপনিই ঝুপঝুপ করে পড়ে, নদী-নালা-খাল-বিল ভরে যায়। তাছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠের সত্তর শতাংশই তো জল (যদিও পানীয় জল সংরক্ষণের কথা বললেই যাঁরা এই পরিসংখ্যানটি ছুঁড়ে দেন, তাঁদের এক গ্লাস সমুদ্রের জল খাইয়ে দেখলে হয় কেমন লাগে!)। তাই জলের আবার দাম কী ! আর হীরে ? ওরে বাবা, সোনার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মানুষের জীবনধারণে বা জীবনযাত্রায় অপরিহার্যতার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে যাকে 'অমূল্য' বলা উচিত, বাস্তবজীবনে তা অনেকক্ষেত্রেই স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন। সৌজন্যে উদ্বৃত্ত সরবরাহ। ঘুরিয়ে বলতে গেলে, কোনো জিনিসের দাম কতটা আকাশছোঁয়া হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে তার দুষ্প্রাপ্যতার ওপর। কিন্তু পুরোটা নয়। কারণ অন্য কতকগুলো ব্যাপারও আছে। যেমন, 'লাজবতী নুপুরের রিনিঝিনিঝিনি'র মতো এ-জগতে আরো অনেক পণ্যের প্রতিই

মানুষের মনোভাব — 'ভাল যদি লাগে তবে দাম দিয়ে কিনি' । ভোগের তাৎক্ষণিক তৃপ্তি বা মস্তির মৌতাত যে-পণ্যে বেশী পাওয়া যায়, মানুষ সাধারণতঃ তার জন্য বেশী দাম দিতে রাজি — তা সে আখেরে যতই অন্তঃসারশূন্য বা ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হোক না কেন । নাহলে এক বোতল দুধের চেয়ে এক বোতল ভদ্‌কা বা শার্ডোনের দাম বেশী কেন ? বা নুনের চেয়ে নস্যির ? আর যদি সে-জিনিস নিকোটিন বা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের মতো নাছোড়বান্দা নেশার বস্তু হয় যে সেটা না পেলে শরীর-মন অচল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো আর কথাই নেই । লোকে তখন তা কেনার জন্য দেনায় দেনায় দেউলিয়া হয়ে যেতে বা খুন করতেও পিছপা হয়না ।

এরপর আসি হুজুগ-ভিত্তিক আর অনর্থক প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক মূল্যনির্ধারণের কথায় । আধুনিক বিজ্ঞাপন-শিল্পের অন্যতম মূল ভিত্তিই হল ক্রেতাসাধারণের মধ্যে কোনো একটি ভোগ্যপণ্য নিয়ে হুজুগ সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে তার চাহিদা আর দাম যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া । অর্থাৎ ঐ পণ্যটি যেকোনো মূল্যে কিনতে না পারলে জীবন বৃথা — এইরকম একটা মানসিকতা ছড়িয়ে দিয়ে লোকজনকে সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক চাপে ফেলে চড়া দামে সেটা কিনতে বাধ্য করা । অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই এই কৌশল সবচেয়ে ভাল কাজ দেয় । উদাহরণ সাম্প্রতিক অতীতে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কচিকাঁচাদের মধ্যে 'বে-ব্লেড্' নামক এক বিশেষ ধরণের লাট্টু কেনার হিড়িক । এই লাট্টুর নির্মাতা জাপানী কোম্পানীটি তো হুজুগ তৈরী করার জন্য একটা আস্ত কমিক-বুক সিরিজই ছাপিয়ে ফেলেছিল ('বাকুতেন শুতো বেইবুরেদো' বা 'Explosive Shoot Beyblade'), যা শিশুদের মধ্যে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা পায় । অবশ্য প্রাপ্তবয়স্করাও হুজুগের ব্যাপারে কিছু কম যান না, যদি ট্যাঁকের জোর থাকে । ক্রিস্টিস্, সোদেবিস্, স্কিনার্স, ডয়েল্‌স্, বন্‌হ্যাম্ অ্যান্ড বাটারফিল্ড্ ইত্যাদি নামকরা সংস্থায় এবং দুনিয়া জুড়ে আরো অসংখ্য নাম-না-জানা সংস্থায় প্রতিনিয়ত যেটা হয়ে চলেছে — অর্থাৎ নিলাম — তাকে হুজুগ বা খেয়াল-নির্ভর টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় ? নিলামে কোন্ জিনিসের দর কোথায় উঠবে — কোনো চাহিদা-যোগান-ভিত্তিক তত্ত্ব দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়না । ওটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে উপস্থিত ক্রেতাদের ব্যাংক-ব্যালেন্সের জোর, বৈভবের অহংকার আর টেস্টোস্টেরন-প্রভাবিত 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবের ওপর । ধরা যাক পিকাসোর কোনো অজানা ছবি বা রদাঁর কোনো সদ্য-আবিষ্কৃত ভাস্কর্য নিলাম হচ্ছে । ওগুলো দুর্লভই শুধু নয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ । চাহিদা যতই বেশী হোক, যোগান বাড়াতে হলে প্ল্যানচেটে পিকাসো বা রদাঁর আত্মাকে পরলোক থেকে ডেকে আনতে হবে । কিন্তু নিলামে শেষ অবধি যে অবিশ্বাস্য দামে ওগুলো বিকোবে, তার কারণ ঠিক দুষ্প্রাপ্যতা নয় — বিত্তের দাম্ভিক প্রতিযোগিতা । নিলামকারী সংস্থা হয়তো একটা ন্যূনতম মূল্য ঘোষণা করল প্রথমে । সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোটীপতি — যাঁর টাকায় (কালো বা সাদা) ছাতা পড়ে যাচ্ছে — আঙুলের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন তিনি দ্বিগুণ দাম দিতে তৈরী । অবিলম্বে সেই ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো জাঁদরেল শিল্পপতি তাঁকে টেক্কা দিতে আর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে বাড়িয়ে ধরলেন চারগুণ দাম । এইরকম চলতে চলতে শেষে দেখা গেল একটা ছবি বা মূর্তি কেনা হচ্ছে আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার কোনো গরীব দেশের শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্য-খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের চেয়েও বেশী টাকায় । পিকাসো বা রঁদার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে এ-জিনিস হলে তাও হয়তো সহ্য করা যায় । কিন্তু পিকাসোর পোষা বেড়ালের গলায় ঝোলানো ঘন্টার আংটা বা রদাঁর বাড়ীর জানলার ফ্রেমের পেরেক নিয়েও যে প্রায়ই এইরকম আদিখ্যেতা হয় ।

চাহিদা-যোগানের মামুলি অর্থনৈতিক সমীকরণ দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়না যেসমস্ত ব্যাপার, তার মধ্যে একটা হল সীজ্‌নাল প্রাইসিং বা ঋতুনির্ভর মূল্যনির্ধারণ । এমনিতে আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে কমলালেবু বা টোপাকুল শীতকালের ফল, তাই বছরের অন্যান্য সময় খেতে গেলে (যা কোল্ড্ স্টোরেজের কল্যাণে মোটেই অসম্ভব নয়) বাড়তি পয়সা গুনতে হবে, যেমন গুনতে হবে শীতকালে আম বা তরমুজ চাখার শখ হলে । কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক ঐ ঋতুনির্ভরতার কথা বলা হচ্ছে না, বরং 'তিথি-নির্ভরতা' কথাটা ব্যবহার করলে ভাল হয় । যেমন, জামাইষষ্ঠীর দিন ভেটকিমাছ আড়াইশোর বদলে সাড়ে তিনশো টাকা কিলো বা মুরগীর মাংস দেড়শোর বদলে দুশো পঁচিশ শুধু বাজারের ব্যস্ততম ব্যাপারীদের কাছেই নয়, যেসব দোকানে খদ্দেরের তেমন ভীড় নেই — সেখানেও । পুজোর ঠিক আগে অভিজাত পাড়ার নামকরা দর্জির দোকানগুলোতেই শুধু পোশাকের মেকিং চার্জ হাইজাম্প দেয় না, গলির গলি তস্য গলিতে হারু টেলারিং-এর ঘুপচি দোকানেও একই ছবি । পাশ্চাত্যদেশেও বড়দিনের মরশুমে পঁচিশে ডিসেম্বারের আগে যে ঘর-সাজানোর উপকরণ

বা থ্যাংক্‌স্‌গিভিং ডে-র আগে যে টার্কিপাখীর মাংস অস্বাভাবিক দামী ছোট-বড় সব দোকানেই, উৎসবের পরের দিনই সেসব জিনিস 'বিকালবেলায় বিকায় হেলায়' ভগ্নাংশমাত্র (অর্থাৎ স্বাভাবিক) দামে। এমন তো নয় যে প্রতিবছর জামাইষষ্ঠী বা থ্যাংক্‌স্‌গিভিং ডে-র আগে মুর্গী বা টার্কির আকাল পড়ে যায় অথবা বড়দিনের আগে সজ্জাসামগ্রী চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয়না। বরং ঐ সময়গুলোতে জনসাধারণের বাড়তি চাহিদা মেটাতে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন বাড়ানো হয় কিংবা গুদাম থেকে বাড়তি পণ্য বাজারে ছাড়া হয়। সুতরাং চাহিদাও যেমন বেশী, যোগানও তেমনি বেশী। তাহলে দাম বাড়ার কারণ ? আসলে এইসব বিশেষ বিশেষ তিথি-পার্বণের দিনে বা তার ঠিক আগে জনগণ যে খরচের ব্যাপারে চিরকালই একটু বেশী দরাজ-হাত — ব্যাপারীরা যুগ যুগ ধরে সেটা জানেন বলেই এই সুযোগে চড়া দাম হেঁকে যথাসম্ভব মুনাফা করে নেন, যাতে বছরের অন্যান্য সময় তুলনামূলক মন্দা চললেও সামগ্রিকভাবে পুষিয়ে যায়।

চাহিদা-যোগানের পরিচিত টানাপোড়েন যাদের দামের ওঠাপড়াকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করে না, সেই তালিকায় আছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক পণ্য ও পরিষেবা। যেমন পেট্রোল (গ্যাসোলিন), বিদ্যুৎ আর স্বাস্থ্যপরিষেবা। খনিজ তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের যোগান বাড়লেই যে আপনার বাড়ীর সামনের পেট্রোল পাম্পে গ্যালন-প্রতি পেট্রোলের দাম কমবে — তা কিন্তু নয়। যেসব পরিশোধনাগার থেকে তেল আপনার বাড়ীর সামনের পাম্পে আসে, তাদের দৈনিক পরিশোধন-ক্ষমতা যতক্ষণ না বাড়ছে, আপনার মানিব্যাগে কোনো পরিবর্তন টের পাবেন না। আবার এটাও সত্যি যে পেট্রোলের দাম অনেকটা কমে গেলে লোকে হয়তো ছোট গাড়ীর বদলে প্রচুর পেট্রোল-পোড়ানো বড় গাড়ী কিনবে, হাতের কাছে ট্রাম-বাস থাকতেও গাড়ীতে অফিস-ইস্কুলে যাবে, সপ্তাহান্তে বা দীর্ঘ ছুটিতে গাড়ী নিয়ে দূরে দূরে বেড়াতে যাবে। তাতে পেট্রোলের চাহিদা বাড়বে, কিন্তু ভয়ংকরভাবে নয়। কারণ পেট্রোল সস্তা বলে মানুষ নিশ্চয়ই একটার বদলে পাঁচটা নতুন গাড়ী কিনবে না বা অকারণে দিনে দুবার-তিনবার করে অফিস-ইস্কুলে যাবে না। আর বছরে সপ্তাহান্ত তো সেই বাহান্নটা, যার মধ্যে মাত্র গোটা পাঁচেক লং উইকেন্ড্। লোকে চাইলেও কত আর বেড়াবে ? সুতরাং এই সীমিত বাড়তি চাহিদার ব্যুমেরাং এক্ষেত্রে দাম বাড়ানোয় বিশেষ কার্যকরী হবেনা। একইভাবে, বিশ্ববাজারে খনিজ তেলের যোগান কমে যাওয়ায় দাম বেড়ে গেলেও গণপরিবহন-হীন ছোট শহরে ও গ্রামেগঞ্জে যারা প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য গাড়ীর ওপর একান্ত নির্ভরশীল কিংবা প্রচন্ড শীতে যারা তেল পুড়িয়ে বাড়ী গরম রাখে বা কলকারখানার জেনারেটর চালায়, তাদের কাছে চাহিদা কমানোর কোনো পথ খোলা নেই। তাই পড়তি চাহিদার উল্টো ব্যুমেরাংও খুব একটা শক্তিশালী হবেনা। মোটামুটি একই ব্যাপার বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও। দাম কমলেই যে কেউ চব্বিশ ঘন্টা বাড়ীর সব আলো আর পাখা জ্বালিয়ে বা চালিয়ে রাখবে, বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ক্রিস্‌মাস বা দিওয়ালীর মতো আলোকসজ্জা করে রাখবে বাড়ীতে — তার সম্ভাবনা কম, কারণ করলে সেটা হাস্যকর পাগলামি হবে। অতএব চাহিদা বাড়লেও সীমিতভাবে বাড়বে। অপরদিকে দাম যতই বাড়ুক, একবিংশ শতকে বিদ্যুতের চাহিদা কমার প্রশ্নই ওঠেনা। প্রসঙ্গতঃ, পেট্রোল আর বিদ্যুতের মধ্যে আরেকটা মিল হল দুটোর দামই কিন্তু বহুদূরে ঘটতে থাকা ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রলয়ঝড় ক্যাট্‌রিনায় যখন লুইসিয়ানা আর টেক্সাসে উপসাগরের তীরবর্তী পরিশোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বারো বছর আগে, সারা দেশে পেট্রোলের দাম একলাফে চড়ে গিয়েছিল অনেকটা। সম্প্রতি হার্ভির বেলায়ও তাই হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতাপ্রবণ দেশগুলোতে কোনো বড়সড় যুদ্ধ বাধলে গোটা পৃথিবী জুড়েই জ্বালানী তেলের দাম বাড়বে — কোথাও কম, কোথাও বেশী। আজ যদি ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রধান বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কোনো দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয় ঘটে, মিসিসিপির পূর্বপারের বাসিন্দারা তাঁদের ইলেক্ট্রিসিটি বিলে তার প্রতিফলন কিছুটা হলেও দেখতে পাবেন।

হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় স্বাস্থ্যপরিষেবার বেলায় আবার চাহিদা সবসময়েই ঊর্ধ্বমুখী (বিশেষতঃ উন্নত ও আধা-উন্নত দেশগুলিতে, যেখানে মানুষের গড় আয়ু ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় তাদের বর্তমান জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশই প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের কবলে)। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় পেশাদার বিশেষজ্ঞের যোগান সবসময়েই কম এবং যেহেতু মানুষের জীবন বলে কথা, তাই টাকার অংকটাকে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেওয়া চলেনা — যতক্ষণ সামর্থ্য আছে। জীবনদায়ী ওষুধ-প্রস্তুতকারক সংস্থা ও গবেষণাগারগুলি তাদের মুনাফা আর ব্যয়বহুল গবেষণার ক্রমবর্ধমান খরচের কথা ভেবে ওষুধপত্রের দাম কমাতে চায় না। আর সমাজে ঈশ্বরস্বরূপ ভাবমূর্তি যাঁদের, আমাদের বাঁচা-মরা যাঁদের হাতে, সেই

ডাক্তাররাই বা ধনতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় কম পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করবেন কেন ? তাই আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গণ-স্বাস্থ্যপরিষেবা গভীর সংকটের সম্মুখীন । কোথাও নাগরিকদের মহার্ঘ্য স্বাস্থ্যবীমা করে চিকিৎসার অভাবনীয় খরচ আংশিকভাবে সামাল দিতে হয় এবং যাদের তা করার উপায় নেই, অসুস্থ হলেই চরম সংকটে পড়ার ভয়াবহ সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে তারা সর্বদা কুঁকড়ে থাকে । কোথাও আবার উদারপন্থী সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব স্বাস্থ্যপরিষেবার মাধ্যমে সমস্ত নাগরিককে ঢালাও নিরাপত্তা দিতে গিয়ে খরচের ভারে হিমশিম খায়, বাজেট ঘাটতি মেটাতে পারে না । এ দুটোর কোনোটাই নয় যেখানে, সেখানে কোটী কোটী নাগরিক 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে সুরক্ষাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে ভাগ্যের ভরসায় । এর ফলে দেখা যায় একই পরিষেবার (যেমন ক্যাট্স্ক্যান্ বা ডায়ালিসিস) দাম কোনো দেশে হাজার হাজার ডলার (যার নব্বই-পঁচানব্বই শতাংশই মেটায় স্বাস্থ্যবীমা), কোনো দেশে এক কানাকড়িও না, আবার কোথাও হয়তো সরকারী হাসপাতালে সস্তা (যদিও রোগীর ভীড়ে জায়গা পাওয়া কঠিন) কিন্তু বেসরকারী নার্সিংহোমে আকাশছোঁয়া ।

দাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যখন, দুটো জিনিষের কথা না বললে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । সেল্ আর ডিস্কাউন্ট । কয়েক দশক আগে অবধি বাংলায় ছিলেন যাঁরা, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে চৈত্রের সেল্ আর পুজোর সেলের কথা । বছরে সাকুল্যে ওই দু-তিনটি সেল্ — তাদের জন্যই ক্রেতাসাধারণের উদগ্রীব অপেক্ষা । প্রথম এদেশে আসার পর যখন দেখলেন এখানে ক্রেতা সেল্ খুঁজে বেড়ানোর বদলে সেল্-ই ক্রেতাকে তাড়া করে বেড়ায় জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বার, অবাক হয়েছিলেন তো ? ছেলেবেলায় শোনা একটা হাসির কথা মনে আসছে এই প্রসঙ্গে । বলা হতো, বাঙালীরা দুর্গাপুজোর পাঁচদিন শুধু নয়, পুজোর বোধনের আগের দিন আর ভাসানের পরের দিনও ছুটি পেয়ে এমন অভ্যস্ত যে প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী বা স্বাধীনতা দিবসেও একদিন ছুটিতে মন ভরেনা । ওগুলোরও 'বোধন' আর 'ভাসানের' ছুটি চাই । তা, মার্কিন মুলুকে সেলেরও সেই অবস্থা । ডিসেম্বারের শেষ সপ্তাহে ইংরেজী নববর্ষ আসছে তাই সেল্, নববর্ষের দিন ঐ উপলক্ষ্যে সেল্, আবার তার পরের দিনগুলোতে অবিক্রীত পণ্যের 'ক্লিয়ারেন্স' সেল্ । একই ছবি ইস্টার, মেমোরিয়াল ডে, স্বাধীনতা দিবস, লেবার ডে ইত্যাদি ছোট-বড় সব উপলক্ষ্য ঘিরেই । প্রশ্ন উঠতে পারে, সেল্ মানে তো যে জিনিসের যা দাম তার অনেক কমেই সেগুলো বেচে দেওয়া — এতে বিক্রেতার ক্ষতি বই লাভ তো হওয়া সম্ভব নয় । তাহলে বছরভোর নানা অছিলায় ক্রমাগত সেল্ দেওয়ার যৌক্তিকতা কী ? উত্তর হল, যথেষ্ট যুক্তি আছে । দোকানে বা গুদামে অনেকদিন ধরে পড়ে থাকা পণ্যসামগ্রী, যা হালফ্যাশনের নয় বলে বা ছোটখাটো কোনো খুঁত আছে বলে বা স্রেফ্ দাম বেশী বলে লোকে কিনতে চাইছে না, সেল্ দিলে সেসব জিনিসই জটায়ুর অর্থাৎ লালমোহন গাঙ্গুলির সেই 'হট্ কচুরিস'-এর মতো বিকোয় সাধারণতঃ । এতে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ তৈরীর বা আমদানির খরচটা তো অনেকটা উঠে আসে বিক্রেতাদের । তাছাড়া দোকানের কিছু কিছু মালপত্র যদি সেলে থাকে আর সেই সুবাদে বাইরের হোর্ডিং-এ বড় বড় অক্ষরে 'সেল্ ! সেল্ !! সেল্ !!!' বলে ঘোষণা করা থাকে, এমনিতে যারা নির্লিপ্ত উপেক্ষায় সেই দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেত তারা কৌতূহলী হয়ে ঢুকবে এবং যেসব জিনিস সেলে নেই সেগুলোও হয়তো আকর্ষণীয় মনে হলে কিনবে । আর সেল্ দেওয়া মানেই যে সবকিছু নামমাত্র দামে বিলিয়ে দেওয়া — তা তো নয় । যে জিনিসের যা বাজারী দাম, প্রাইস্ স্টিকারে তার পঁচিশ শতাংশ বাড়িয়ে লিখে সেই বাড়তি দামের ওপর কুড়ি শতাংশ ডিস্কাউন্ট দিলে যে কোনো ক্ষতিই হয় না — তা তো সেই ক্লাস ফাইভের অংক বইতেই বলা আছে । সবচেয়ে বড় কথা, সেলের ওপর একটা সময়সীমা আরোপ করে দিলে (যেমন, 'এইসব অবিশ্বাস্য দাম শুধুমাত্র সামনের শনিবার অবধি !') ক্রেতাদের সেই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক চাপে ফেলা যায় যার কথা আগেও বলেছি । সকলেই জানে শনিবার পেরিয়ে গেলে পরদিন অর্থাৎ রবিবার ভোরেই আবার কোনো নতুন অজুহাতে নতুন সেল্ শুরু হবে । তবু মন মানতে চায় না — মনে হয়, ইস্, এতবড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে ! আর যদি কোনো সেলকে ঘিরে দেশব্যাপী উন্মাদনার ঐতিহ্য তৈরী হয়ে যায়, ক্যালেন্ডারে লাল দাগ দেওয়া উৎসব বা পালপার্বণের মতো যদি বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে লোকে তাকিয়ে থাকে সেই সেলের আশায়, তাহলে তো কথাই নেই । উদাহরণ, আমেরিকায় থ্যাংক্স্গিভিং থার্স্ডের ঠিক পরের দিন ব্ল্যাক্ ফ্রাইডে সেল্ । লোকে থ্যাংক্স্গিভিং-এর সন্ধ্যা থেকেই দোকানে দোকানে লাইন লাগায় তার জন্য, রাত কাটায় বন্ধ দোকানের সামনে পার্কিং লটে ।

পশ্চিমী দুনিয়ার 'বোগো' আর 'বোগেট' (অর্থাৎ 'বাই ওয়ান্ গেট্ ওয়ান্ ফ্রী' আর 'বাই ওয়ান্ গেট্ টু ফ্রী') কিংবা আমাদের ছোটবেলায় দেখা পাড়ার দোকানের সেই গুঁড়ো-সাবানের প্যাকেট কিনলে গায়ে-মাখা সাবান ফ্রী — সবকিছুর পিছনেই মূলতঃ দুটো উদ্দেশ্য । হয় কোনো পণ্যের উদ্বৃত্ত স্টক্ দ্রুত খালি করার জন্য পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়ে তাকে অতি-লোভনীয় করে তোলা ('ফ্রী' শব্দটা দেখলেই লোকে এমন মধুলোভী মৌমাছির মতো তার দিকে ছুটে যায় যে ভেবেও দেখেনা একটা কিনলে আরেকটা বিনাপয়সায় পাওয়া আর দুটো জিনিস আদ্ধেক দামে কেনার মধ্যে কোনো তফাত নেই) অথবা কোনো অপরিচিত ব্র্যান্ডের সাধারণ মানের পণ্য ক্রেতাদের গছানোর চেষ্টা । তাছাড়া বড় বড় করে 'BUY ONE GET ONE FREE !!' বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে চুম্বকের মতো জনগণকে দোকানের দিকে টেনে আনার ব্যাপারটাও আছে। ক্রেতা-আনুগত্য (customer loyalty) ধরে রাখার জন্য খুচরো ব্যবসায়ীরা আরো একটি অস্ত্র প্রায়শঃই প্রয়োগ করে থাকেন। ডিস্কাউন্ট কুপন। খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় ছাপানো কুপন, ডাকযোগে বাড়ীতে পাঠানো কুপন, চেক্-আউট কাউন্টারে জিনিসপত্রের দাম দেওয়ার সময় প্রাপ্ত রসিদের উল্টোদিকে কুপন, ইত্যাদি ইতাদি । তবে পাশ্চাত্য দুনিয়ার অতিব্যস্ত জীবনযাত্রায় মানুষের অত সময় কোথায় যে খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে আর পুরনো রসিদ হাতড়ে কুপনগুলো কেটে রাখবে ? তাই এতে হয়তো আজকাল প্রত্যাশামতো কাজ হয়না। তার মানে এই নয় যে কুপনগুলো কারো কোনো উপকারে লাগে না, ফেলা যায়। অন্ততঃ নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের দিন-আনা-দিন-খাওয়া সংসারে ওগুলো বিরাট ভরসা।

এ তো গেল ইঁট-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরী সত্যিকারের দোকানের কথা (brick-and-mortar stores)। বলাই বাহুল্য তার বাইরেও ইলেক্ট্রনিক বা অন্‌লাইন কেনাবেচার একটা বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান জগৎ আছে। সেখানেও প্রতিনিয়ত সেলের রমরমা, কোনো কোনো সেল্‌কে জাতীয় মহোৎসব বানিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়ানোর প্রবণতা (যেমন সাইবার মান্‌ডে) এবং বোগো আর ডিস্কাউন্ট কুপনের ছড়াছড়ি। কিন্তু তার সঙ্গে আছে একটা নতুন টোপ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেনা জিনিসপত্র তো আর কম্পিউটার স্ক্রীন্ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে মানুষের হাতে পৌঁছয় না। পৌঁছয় ডাকযোগে বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে। তারও খরচ আছে। অতএব একটা নির্দিষ্ট অর্থমূল্যের বেশী জিনিস কিনলে তা বিনাপয়সায় বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার লোভ দেখানোটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আর ই-কমার্স বা সাইবার-কমার্সের দুনিয়ায় পরস্পরের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিপণনসংস্থার মধ্যে এত প্রতিযোগিতা যে তারা অনেকেই 'প্রাইস্ ম্যাচিং' অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েব্‌সাইটে পাওয়া ন্যূনতম মূল্যে নিজের পণ্যসামগ্রী বিক্রী করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অবশ্য এই পন্থাটি ঠিক নতুন নয়, এদেশে brick-and-mortar দোকানগুলোতেও অনেকদিন ধরেই প্রাইস্ ম্যাচিং-এর প্রচলন আছে। যেমন, জে সি পেনিতে কেনাকাটা করতে গিয়ে যদি প্রমাণ দাখিল করা যায় যে একই পোশাক মেন্‌স্ ওয়্যারহাউসে অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, তারা সেই হ্রস্বমূল্যেই ওটা বেচতে রাজী হয়ে যাবে। বরং ইলেক্ট্রনিক বা অন্‌লাইন বিকিকিনিতে যে প্রবণতাটা নতুন, তাকে এক অর্থে opportunistic pricing বা সুযোগসন্ধানী মূল্যনির্ধারণ বলা যেতে পারে । এই জিনিসটার উৎপত্তি জীবনদায়ী ওষুধের ব্যবসায়। কয়েক দশক আগে মারণব্যাধি এইচ্ আই ভি/এইড্‌স্-এর প্রথম কার্যকরী চিকিৎসা HAART (হাইলি অ্যাক্টিভ্ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি) যখন বাজারে আসে, তাতে AZT (Zidovudine) বলে একটা ওষুধ ছিল যার প্রস্তুতকারক সংস্থা (বারোজ্ ওয়েল্‌কাম) অবিশ্বাস্য বেশী দামে বিক্রী করা শুরু করে ওটা। তাদের যুক্তি, ঐ ওষুধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণার খরচও ছিল একইরকম অবিশ্বাস্য। তাছাড়া ওটা তো হাতে-গোনা কিছু লোকেরই শুধু দরকার — এইড্‌স্ আর কজনেরই বা আছে ? তাই গবেষণার খরচ উসুল করতে মাথাপিছু দাম বেশীই রাখতে হবে। আসলে তারা বুঝেছিল শরীরে একবার এইচ্ আই ভি সংক্রমণ হলে বাড়তি কয়েকবছর বাঁচার একমাত্র রাস্তা তো HAART, তাই মানুষ নিরুপায় হয়ে যেকোনো দামেই কিনবে সে-ওষুধ। আর যে রোগের কোনো প্রতিষেধক বা টীকা নেই, তা ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তখন মুনাফাও হবে অবিশ্বাস্য। এই লোভী মানসিকতা সাম্প্রতিককালে আবার দেখাল এপিনেফ্রিন্ নামক জীবনদায়ী হর্মোন ইঞ্জেক্শনের (এপিপেন্) প্রস্তুতকারক মাইল্যান্। যাইহোক, ই-কমার্সের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশী হয় যখন ক্রেতার খোঁজাখুঁজির ধরণে (browsing pattern) সার্চ্ এঞ্জিনগুলি একটা অসহায় বা মরীয়া ভাব দেখতে পায়। ধরুন আপনাকে হঠাৎ করে কাল সকালেই নিউ ইয়র্ক যেতে হবে, তাই আজ দুপুরে কম্পিউটারে বসে আপনি প্লেনের টিকিট কাটার চেষ্টা করছেন। বার বার ফ্লাইট্ বুকিং-এর বিভিন্ন সার্চ্ এঞ্জিনে (যেমন চীপ্‌টিকেট্‌স্,

প্রাইস্‌লাইন্‌ বা মেক্‌-মাই-ট্রিপ্‌) গিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটা কি ছটার ফ্লাইটের সবচেয়ে সস্তা ভাড়াটা খুঁজছেন। যদি ভাবেন যত বেশি ওয়েব্‌সাইটে তল্লাশি করবেন কমদামী টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল হবে — এক্কেবারে ভুল। কারণ আপনিই শুধু ওয়েব্‌সাইট্‌ ঘাঁটছেন — তা তো নয়, ওয়েব্‌সাইট্‌গুলোও তাদের 'কুকি'র মাধ্যমে আপনাকে ক্রমাগত জরিপ করছে। খুঁজতে খুঁজতে খানিক বাদে পুরনো ওয়েব্‌সাইট্‌গুলেতে ফিরলে দেখবেন আগে সেখানে যে ন্যূনতম ভাড়া পাচ্ছিলেন এখন তার চেয়ে বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে! অর্থনীতির কচকচি তো অনেক হল, এবার আসা যাক মূল্যনির্ধারণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। অর্থাৎ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি আর আবেগ-অনুভূতিতে 'দাম' শব্দটার কী তাৎপর্য — সেই কথায়। শুরু করি ছোটবেলার একটা ঘটনা দিয়ে। তখনকার দিনে, অর্থাৎ সত্তরের দশকে কলকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে সপ্তাহে একদিন পাঁঠার মাংস খাওয়াটাও বেশ বিলাসিতা ছিল। আমাদের এক পাড়াপ্রতিবেশী ভদ্রলোক প্রতি রবিবার সকালে বাজারের পর আমাদের বাড়িতে চুটিয়ে কয়েকঘন্টা আড্ডা মেরে যেতেন। সরকারী অফিসের ছাপোষা কেরানি, কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতেন, তাও ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ রসবোধ ছিল। একদিন বাজার-ফেরত ব্যাজার মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিদিমাকে বললেন, 'বুঝলেন মাসীমা, আজই প্রথম বাঙালী মাংসাশী হল'। যাঁর উদ্দেশে বলা, তিনি না বোঝায় নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, 'মানে এই প্রথম বাজারে পাঁঠার মাংসের কিলো আশি টাকা ছুঁল'।

— 'বলো কী! তাহলে কিনলে কেন বাবা?'

— 'আর বলবেন না মাসীমা। একটামাত্র ছেলে, সেই কতদূরে রানাঘাটের পোস্টাপিসে পিওনের চাকরী করে, সপ্তাহান্তে একবার বাড়ী আসে। ছোট থেকেই মাংসটা বড় ভালবাসে ও। তাই আর কি —'

অর্থাৎ পাঁঠার মাংসের বাজারী দর যাই হোক না কেন, ছেলেকে কাছে পাওয়ার বিরল মুহূর্তে তাকে প্রিয় খাবার পরিবেশন করে তার পরিতৃপ্ত হাসিমুখ দেখার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী। এবার সময়টাকে কয়েক দশক এগিয়ে আনা যাক। গত শতকের শেষের দিকে টিভিতে মাস্টারকার্ডের সেই জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন মনে আছে? যার বাংলা করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, 'গোলাপফুলের ডজন ২৫ ডলার, চকোলেট বার ১০ ডলার, ফরাসী পার্ফিউম্‌ ৫০ ডলার আর সিনেমার দুটো টিকিট ১৫ ডলার, কিন্তু দিনের শেষে প্রেয়সীর চোখে খুশীর ঝিলিক? অমূল্য!' এসব থেকে এটা পরিষ্কার যে, একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এমন অনেক কিছু থাকে যার আপেক্ষিক মূল্যায়ণ শুধুমাত্র সে-ই করতে পারে — কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্বের আংকিক সমীকরণ নয়। এই একান্ত ব্যক্তিগত মূল্যায়ণ হতে পারে পরিস্থিতিনির্ভর, হৃদয়নির্ভর বা আদর্শনির্ভর, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই যুক্তিনির্ভর নয়। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ের গোড়াতেই যে ধরে নেওয়া হয় মানুষ একটি আদ্যন্ত যুক্তিনির্ভর প্রাণী, সেটা বাস্তবজীবনে পুরোপুরি ঠিক নয়। অবশ্য অর্থনীতিবিদ্‌রা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা বলবেন মানুষের এই ধরণের আচরণ opportunity cost আর personal utility function দিয়ে অনেকটাই ব্যাখ্যা করা যায়। অপরচুনিটি কস্ট্‌ হল আমাদের অতি পরিচিত প্রবাদ 'কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়'-এর তাত্ত্বিক সংস্করণ। আর পার্সোনাল ইউটিলিটি ব্যাপারটা এক অর্থে 'Beauty is in the eye of the beholder'-এর মতো। যেমন ধরা যাক, আমি শিয়ালদা থেকে মালদা কম খরচে ট্রেনে চেপে যেতে পারি। কিন্তু বেশী দাম দিয়ে এয়ারকন্ডিশনড্‌ লাক্সারী বাসে গেলে ভ্যাপসা গরম আর ঠাসাঠাসি ভীড়টা এড়ানো যাবে। সুতরাং ঐ আরামটুকুর জন্য আমি যে বাড়তি ভাড়াটা গুনতে রাজী, সেটাই আমার অপরচুনিটি কস্ট্‌। অন্যদিকে, আপনি হয়তো বলবেন বাসে অনেকক্ষণ জার্নি করলেই আপনার বমি পায় আর ঝাঁকুনিতে রাতে ভাল ঘুমও হয়না, তাই আপনার ট্রেনই ভাল। অর্থাৎ ট্রেনযাত্রার পার্সোনাল ইউটিলিটি বা ব্যক্তিগত উপযোগিতা আমার-আপনার এক নয়। প্রসঙ্গতঃ, এই পার্সোনাল ইউটিলিটি থেকেই জাগে 'ভ্যালু' শব্দটির উপলব্ধি। ফাস্টফুড্‌-সম্রাট ম্যাক্‌ডোনাল্ডসের 'ভ্যালু মিলের' জনপ্রিয়তার কথা সকলেই জানে। তাতে যা আছে (যেমন স্যান্ডুইচ্‌, আলুভাজা, নরম পানীয়), সেগুলো আলাদা আলাদা করে কিনলে মোট দাম বেশী পড়ে, কিন্তু একসঙ্গে 'কম্বো' হিসেবে ওগুলোই একটু কম দামে পেলে ক্রেতারা খুশী হন এই ভেবে যে ভাল 'দাঁও' মারা গেল। কোল্‌গেটের টুথ্‌ব্রাশ আলাদাভাবে একেকটা কুড়ি টাকায় বিক্রী না করে চারটের 'ভ্যালু প্যাক্‌' বা 'ফ্যামিলি প্যাক্‌' পঁয়ষট্টি-সত্তর টাকায় বিক্রী করলেও একই কারণে সেটা বেশী আকর্ষণীয় হবে। অর্থাৎ কায়দাটা হল অংকের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে

ক্রেতাসাধারণের মনে এই তৃপ্তিবোধটা জাগানো যে তাঁদের প্রতিটি পাইপয়সা আরো ভালভাবে উসুল হচ্ছে। এবং অবশ্যই অংকের মারপ্যাঁচটা এমন যাতে বিক্রেতাদেরও সামগ্রিকভাবে আর্থিক ক্ষতি না হয়।

এসবের বাইরেও মানুষের আরো যেসব 'অযৌক্তিক' আচরণ আছে (আর্থিক বিষয়ে), সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয় 'বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স' নামক অর্থনীতির এক আপেক্ষাকৃত নতুন শাখায়। সাম্প্রতিককালে এই নিয়ে গবেষণা করে কেউ কেউ নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্সের তত্ত্ব মানুষের মনের ঠিক কতটা গভীরে ঢুকতে সক্ষম ? যেমন ধরুন, 'ক'-বাবুর পুরনো আমলের পৈতৃক ভিটে কলকাতার কোনো এক দারুণ জায়গায়, যেখানে ইচ্ছে করলেই তিনি সে-বাড়ী বেচে বা প্রোমোটারকে দিয়ে কোটী টাকা পেতে পারেন। তবু তিনি কেন ওটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, বিক্রী করছেন না — সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স বলবে বাড়ীটার সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু (বা স্মৃতিবিজড়িত আবেগভিত্তিক মূল্য) ওঁর কাছে তার বাজারী দামের মার্জিনাল ইউটিলিটির চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই 'ক'-বাবুই এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে হারাবার পর হঠাৎ পৈতৃক ভিটেসহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি মাত্র এক টাকার বিনিময়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে লিখে দিয়ে পুদুচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে চলে গেলেন। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন অর্থনীতিবিদ্‌রা ? বরং এই সিদ্ধান্তের দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক কারণ খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। একইরকমভাবে, আপনার প্রথম ভালো চাকরি পেয়ে কেনা জীবনের প্রথম গাড়ীটা আজ প্রায় দু-দশক পুরনো, তার ওডোমিটারে প্রায় আড়াই লাখ মাইল। ইদানীং তার নানারকম সমস্যা লেগেই আছে। একটা সারালেন, আবার একটা হল। ওটার সারাই-বাবদ মোট যা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে একটা হালফ্যাশনের নতুন ছোটখাটো গাড়ী কিনে ফেলতে পারেন জেনেও ওটাকে ত্যাগ করতে অনীহা। কারণ আবার সেই সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু — আপনার জীবনের বহু উত্থানপতনের সাক্ষী সেই গাড়ী যেন একজন পুরনো বন্ধু। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' বা সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' মনে পড়ছে ? কিন্তু সেই বন্ধুকে হয়তো দুবেলা রাস্তায় নামাচ্ছেন কম্প্রিহেন্‌সিভ্ বা কলিশন্ ইন্সিওরেন্স ছাড়াই — যেহেতু পুরনো গাড়ীর ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্ একটু বেশী। দুর্ঘটনায় আপনার বন্ধু চুরমার হয়ে গেলে তাকে 'বাঁচিয়ে' তোলার খরচটা কিন্তু নতুন গাড়ীর দামের চেয়েও বেশী হতে পারে। দেবেন সেটা নিজের পকেট থেকে ? নাকি ভাবছেন চুরমার হয়ে গেলে ওটাকে বাতিল করে নতুন গাড়ী কেনার একটা অকাট্য অজুহাত তৈরী হবে ? অদ্ভুত ভাবনা, কারণ সেই অকাট্য (অর্থনৈতিক) অজুহাত তো এখনই রয়েছে — ওর ঘনঘন সারাইয়ের খরচ তো ইতিমধ্যেই একটা নতুন গাড়ীর দাম ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। মোটকথা, অর্থনীতিবিদ্‌দের পক্ষে আপনার এই আচরণ বা চিন্তাধারার কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল।

তো এই হল গিয়ে দামের সাতকাহন। শোনা যায় 'দাম' কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ 'দ্রাখ্‌মা' থেকে, সেই পুরাকালে গ্রীকদের ভারত অভিযানের সূত্রে। যেখান থেকেই আসুক, এই বিশ্বায়িত বাজার-অর্থনীতির যুগে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে আর বিচার-বিবেচনায় কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে এই দামের হিসেবনিকেশ। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই। আমরা সমালোচনা করে বলি 'অমুকের কথার দাম নেই', সহানুভূতি জানাতে বলি 'অমুক তার প্রতিভার দাম পেল না', আক্ষেপ করে বলি 'মাটির পুতুল — তারো আছে দাম, শুধু মানুষেরই দাম নেই', ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই না দাম নিয়ে এত কথা লেখা ! নাহলে লেখকের কি সময়ের দাম নেই ?

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত, সিয়াটেল

ভালো ও মন্দে মেশানো তো সবই, তাতে নেই মোটে সন্দ
প্রশ্নটা হলো, কতখানি ভালো এবং কতটা মন্দ
আছে লিমেরিক মিশেলে তে মিশে
যত ভাবি, কিছু পাইনা তো দিশে
(তাই) ভুলে পছন্দ ও অপছন্দ শুধুই মেলাই ছন্দ ।

****

মনের দুঃখ শাস্ত্রীজিকেই গিয়ে বললাম খুলে –
''আমাকে সবাই ঠকায়, আমিও ঠকি তো নিজেরই ভুলে'' ।
শুনেই দিলেন তার প্রতিকার –
''ঠকানো ঠেকাতে শুধু দরকার
একটা যজ্ঞ; হাজার বিশেক দে আমার হাতে তুলে'' ।

****

প্রলয়, sorry, প্রণয় পড়ায় সন্ধে থেকে রাত্রি
মাত্র একই ছাত্র, sorry, ছাত্র তো নয়, ছাত্রী
প্রণয়, sorry, প্রণয় তো নয়
পরের ধাপের নাম পরিণয়
প্রণয় কুমার পাত্র এবং ছাত্রী, sorry, পাত্রী ।

****

চিন্তা করাটা ভালো
তাই মাথা সে ঘামালো
জেব্রা নামক গাধা
কালোরও পর সাদা
নাকি সাদারও পর কালো ?

****

বাণে গেলো জমি, ফলন্ত গাছ, ফসলের গোলা, বাড়ি
— নিশ্চয়ই ওরা করেছিল পাপ, শাস্তি পাচ্ছে তারই ।
পাগল নদীর দুরন্ত ঢেউ
গ্রাস করে নিলো দেবালয়কেও !
— প্রভুর কি লীলা ! সব কি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি ?

****

নেই তো ও পাখি খাঁচায় বন্দি, নয় সে তো বাঁধা দাঁড়ে
পাখিটা তো তবু বসেই রয়েছে, উড়ে তো যাচ্ছে না রে ।
কাটিয়ে জীবন বন্দি দশায়
মুক্তি পেলেও অবশেষে, হায়
ভরসা তো নেই নিজের ডানায়, উড়ে যেতে সেকি পারে ?

****

(তার) হাতে ধরাছিল এক রক্ত গোলাপ
(আর) মনেতে গোছানো ছিল প্রেম সংলাপ
(তবু) মুখোমুখি নার্ভাস ভয়ে ভ্যাবাচ্যাক
(যেন) প্রেম পুষ্পের কাঁটা, অবস্থাদ্যাখ
(শেষে) মুখ থেকে বেরোলো যা, শুধুই প্রলাপ ।

****

‘‘গরুগুলো তো মা সারাদিন মাঠে ঘাস খায় খুঁটে খুঁটে
রাত্রে কি তারা পটি করে দেয় গাছের ওপরে উঠে ?’’
ঘেঁটে ঘ হলো মা যার প্রশ্নেই
ছোট্ট শিশু সে, তার দোষ নেই
দেখাই যাচ্ছে গাছের গুঁড়ির চারদিকে দেওয়া ঘুঁটে ।

শুভ্র দত্ত — সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি ।
তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে — শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা । নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন — মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি । নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা । বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি ।

তুমি রূপকথা নও

বর্ষণজিৎ মজুমদার, Michigan

কবিতা: তুমি রূপকথা নও রূপকথা নও

তুমি বিস্ফোরণের ছাপ ।

তুমি আমার মনের অন্ধকারের

একটা কালো সাপ ।

কবিতা: তুমি পুরস্কারের শেকল তো নও

তুমি পাগলা মনের দিশা ।

তুমি মানিয়ে নেওয়ায় আগুন জ্বালো

তুমি সর্বনাশের নেশা ।

কবিতা: তুমি দামাল ছন্দে আজকে কাটো

প্রথায় ঢাকা পাপ ।

শব্দে তোমার আজকে হারুক

দেবতার অভিশাপ ।

কবিতা: তুমি বন্ধ্যা মনে দুলতে থাকা

সবুজ ধানের শীষ ।

তোমার বিষেই মরুক পুড়ে

ধর্মে ঢাকা বিষ ।

আগে হলে

সুস্মিতা বসু, Texas, USA

আগে হলে তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখে নিতাম

আগে হলে তোমার হাতে হাত গলিয়ে দিতাম

আগে হলে ভেবে নিতাম আছো আশেপাশে

আগে হলে থাকতে তুমি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে

আগে হলে হাসতে তুমি আমায় ব্যঙ্গ করে

আগে হলে রেগে যেতাম তোমায় মাফ না করে

আগে হলে টেবিল জুড়ে কাগজ এলোমেলো

আগে হলে পাশে বসেই দিন গড়িয়ে গেলো

আগে হলে সন্ধ্যা হতো বারান্দার এক কোনায়

আগে হলে তোমার কথায় হতাম আনমনা

আগে হলে উড়িয়ে দিতাম মন ভাঙানো কথা

আগে হলে ভেঙে দিতাম চলতি অনেক প্রথা

অনেক কিছুই অন্য রকম হতো আগে হলে

এখন কি আর তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলে

স্বপ্ন পূরণ করতে হলে সমাজ যাবে পুড়ে

তার চেয়ে বরং এইতো ভালো আছো এ মন জুড়ে ।

মেঘ প্রতিশ্রুতি

স্বর্ভানু সান্যাল, Chicago

এক শ্রাবণী অন্ধকারে
কৃষ্ণ কালো মেঘের ঘটা আকাশ পরে
নির্নিমেষে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করি, শুধাইতারে
ঘুরে বেড়াও উড়ে বেড়াও কিসের তরে ?
আকাশ জুড়ে
রঙ মাখা ঐ মেঘচাদরে
মুখ ডুবিয়ে মন্দ্র স্বরে
কাকে ডাক ?
কোন সে চাতক চুপি সারে
তোমায় পাওয়ার লোভে চলে অভিসারে ?
কোন সে আলো মুখ লুকিয়ে চুপ শরীরে
তোমায় ছুঁলো -
মৃত্যু নিল শরীর জুড়ে

কোন সে কবি একদুপুরে
তোমায় নিয়ে লিখবে বলে
সারাবেলা রইলো বসে কলম ধরে . . .
মেঝের পরে রইলো পড়ে
ছিন্ন কিছু শব্দ
কোন এক শেষ না হওয়া কণ্ঠহারে ।

কোন এক মাঝি বৈঠা ধরে
পথ হারাল তোমার খোঁজে
সুর বাঁধলো বাউল সুরে
জানালা পথে একটুকরো তোমায় পেয়ে
কোন সে জন পদ বধু রইলো পরে ঠোঁট কামড়ে
শিয়াল কিছু আঁচড়ে কামড়ে
আশ্লেষে প্রাণ ভরিয়ে দিল । গলিরমোড়ে
কোন সে অপু তোমায় দেখে বারে বারে
খেলা ছেড়ে রইলো চেয়ে
রইলো চেয়ে ঐ সুদূরে
কোন সে গৃহ বধু সেদিন দরজা ধরে
একলাটি প্রতীক্ষা করে
সেই সে জনের
যে জন কোথায় হারিয়ে গেছে বন পাহাড়ে ?

কোন সে ডাহুক চুপিসারে
তোমার সাথে ভিজবে বলে দিগ বলয়ের কাছে ওড়ে ?

***

মেঘ বললে,
আমি আমার ভেলায় নিয়ে ফিরি আশা
ফেরি করি বৃষ্টি-ভেজা-ভালবাসা
অনাগত এক স্বপ্নমুলুক, সুলুক দিতে আমার আসা

ভালবাসি বলছে শুধু, বলছে আমার মন্দরভাষা
ভালবাসার জোয়ার জলে ভাসিয়ে দেব সব নিরাশা ।
ভিজিয়ে দেব গৃহ বধূর বুকের আঁচল, সবতিয়াশা
ঝড় তুলব সর্বনাশা
সেই ঝড়েতে বিলীন হবে শীর্ণ শিথিল সব কুয়াশা
নতুন জগৎ জন্ম নেবে, নতুন দিশা
আসবে সাথে, আসবে আবার নতুন করে ভালবাসা ।।

Swarvanu Sanyal — Software engineer living in Naperville, Illinois. I regularly write poems, fictional works like short stories, short plays and non-fictional works like essays in different topics.

পিন্টুর পঞ্চমী

পিনাকী গুহ, Chicago

আজ মহাপঞ্চমী।

ডুমুরগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডের পাশের পুজোর প্যান্ডেলে ঢাকের বাদ্যি বাজছে সকাল থেকে। এখন বিকেলবেলা। পড়ন্ত বিকালের রোদ্দুর বাসরাস্তা ছাড়িয়ে কাশফুলের জঙ্গল, খেলার মাঠ আর ধানক্ষেতের উপর লুকোচুরি খেলছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানটা পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই একটা অশ্বত্থ গাছ। সেটা পেরোলে ডান হাতে ফুটবল মাঠ। মাঠের অনেকটা জুড়ে এখন বারোয়ারি পুজোর প্যান্ডেল। সেই মাঠটা পেরিয়ে প্রথম বাড়িটা পিন্টুদের। ন'বছরের পিন্টু। এখন অধৈর্য্য হয়ে বাড়ির সামনেটায় হেঁটে বেড়াচ্ছে অনেকক্ষণ, বাবার অপেক্ষায়।

পিন্টুর বাবা সপ্তাহের শেষে গ্রামে ফেরে — পিন্টু আর পিন্টুর মায়ের কাছে। শহরে কারখানার কাজে সামান্য আয়। তারপর দু'মাস হল পিন্টুর ইংরেজী মাস্টার রাখা হয়েছে। তাতে সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব হয়েছে আরও জটিল। আর এই জটিলতায়, পিন্টুদের পুজোর নতুন জামাকাপড় এখনো পর্যন্ত হয় নি। আজ বাবার বাড়ি ফেরার কথা পুজোর ছুটিতে — কারখানা থেকে পুজোর বখশিস নিয়ে। বাবা কথা দিয়েছে, মায়ের জন্য শাড়ি আর পিন্টুর জন্য নতুন জামা-প্যান্ট আর স্কুলের জুতো নিয়েই ফিরবে।

তা সাড়ে চারটে তো বেজে গেল। বাবা তো আর আসে না! মা সারা দুপুর ধরে খদয়ের মোয়া বানাচ্ছিল। পিন্টু বসে বসে তাই কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বাইরে এসে মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে চেয়ে থাকল অপলক। তার থেকে সে একেবারে বাস স্ট্যান্ডে চলে যাবে? যাতে বাস থেকে নামলেই বাবাকে দেখতে পায়? কিন্তু বাবা যদি খালি হাতে ফেরে? যদি পুজোর বখশিস না পায়? এমন আগেও হয়েছে। বাবা কথা দিয়ে কথা রাখে না। এই যেমন বছর দু'এক আগে রথের মেলায় একটা মস্ত বড় কাঠের ঘোড়ার খুব শখ হয়েছিল পিন্টুর। বাবা বলেছিল এনে দেবে শহর থেকে। আর আনে নি। অনেকগুলো দিন হাপিত্যেশ করার পরে পিন্টু আশা হারিয়ে ফেলে। মা বোঝাতো অনেক পিন্টুকে। বাড়ির অভাব ইত্যাদি সব সাদা-কালো কথা। পিন্টু ক্রমে বুঝে নিয়েছে। এখন একটু বড়ও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পুজোর জামা হবে না? ওর সব বন্ধুদের — রানা, দীপু, সুভাষ সবার নতুন জামা-প্যান্ট হয়ে গেছে। কয়েকজনের আবার দু-তিনটে। পিন্টু মুখ দেখাবে কি করে ওদের?

এদিকে পাঁচটা বাজে। পঞ্চমীর রোদ্দুর লুকিয়ে পড়েছে ওদের বাড়ির পিছনের জঙ্গলটাতে। পিন্টু তবু চেয়ে আছে সামনের মাঠের দিকে। মাঠের উপর প্যান্ডেল, লাল শালুর সামিয়ানা পেরিয়ে বাস রাস্তার দিকে। মাঠের একটা কোনে শুকনো কাদা আর অযত্নে বেড়ে ওঠা বড় বড় ঘাস। সেই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই পিন্টুর কয়েকজন বন্ধু সেখানে ফুটবল খেলছিল। পিন্টুকে ডেকেও ছিল। ও যায় নি। আজ আর ভাল লাগছে না খেলতে।

'মা, বাবা তো এখনো এল না!'

পিন্টুর মা সবে মোয়া বানানো শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'আসবে রে আসবে! মানুষটা একা কেনাকাটা করছে তো। তাই একটু দেরী হচ্ছে।'

মায়ের গলাটাও কি একটু উদ্বিগ্ন শোনাল?

ছ'টা প্রায় বেজে গেল। মা সন্ধ্যে দিতে ঘরে চলে গেল। ঘাসফুল আর নলখাগড়ার মাথায় সারাদিন নাচানাচি করে ঘরে

ফিরে গেছে ফড়িং আর প্রজাপতির দল । পিন্টু এখন একা উঠোনে । কেউ প্যান্ডেলের পিছন থেকে রঙমশাল জ্বালাল একটা । পোড়া বাজির গন্ধে মনটা আরও উদাস হয়ে গেল পিন্টুর । যেন নিভে গেল সব আনন্দ ।

বাবা ঠিক টাকা জোগাড় করতে পারে নি ।

তাই আসছে না ।

আর হল না এ বছরে পুজোর জামা । স্কুলের নতুন জুতো, মায়ের শাড়ি কিচ্ছু হল না ।

পিন্টু বেরোবেই না ঠাকুর দেখতে এবার ! অঞ্জলি দেবে না মা-বাবার সঙ্গে । অনেক সাধলেও না ।

ঠিক মাথার উপরে জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারা । উঠোনে শিউলিতলায় দপ দপ করে সান্ধ্যবিহারে বেরিয়েছে জোনাকির দল । এমন সময়ে হঠাৎ দীপু ছুটতে ছুটতে আসে পিন্টুদের বাড়ির সামনে ।

‘এ্যাই পিন্টু, তোর বাবা আসছে । বাস থেকে নামতে দেখলাম ।’

‘কই ? কোথায় ?’

‘ঐ তো !’

বাবাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই কম আলোতেও । ঝড়ঝাপটা সামলানো নুয়ে পড়া শরীর । ঝোলা কাঁধ । ধীর পায়ে দু‘দুটো মস্ত জামা-কাপড় আর শাড়ির ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে আসছে ।

‘মা ! বাবা এসে গেছে ।’ বলেই ‘বা-বা-আ-আ-আ !’

তীর বেগে শুকনো কাদা ভেঙে, কাশফুলের জঙ্গল ছাড়িয়ে পিন্টু ছুটল ওর বাবার দিকে ।

আর ঠিক এই সময়ে, জ্বলজ্বল করে উঠল আকাশে হাজার হাজার তারা । ফড়িং আর প্রজাপতির দল ফিরে এসে নলখাগড়া আর ঘাসফুলের উপর আবার নাচতে শুরু করে দিল । মাঠময় জ্বলে উঠল অনেকগুলো রঙমশাল । বারোয়ারি পুজোর প্যান্ডেলে ঢাকের বাদ্যি বাজতে থাকল দ্বিগুন জোরে । মন্ডপে আনন্দময়ী মায়ের মুখে হাসি যেন ধরে না আর !

[আমার অন্যতম প্রিয় কবি জয় গোস্বামীর একটি কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত]

পিনাকী গুহ – জন্ম দক্ষিনেশ্বর । বেড়ে ওঠা চন্দননগরে । কর্মসূত্রে চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই থেকে পাড়ি মার্কিন মুলুকে । অধুনা বৃহত্তর শিকাগোর বাসিন্দা । স্ত্রী পৌলমী ও একমাত্র পুত্র প্রমিতকে নিয়ে চলে সংসারের আঁকিবুকি । এরই মাঝে নেশা আড্ডা, অসময়ে ঘুম আর লেখালিখি ।

ছেলেটা

লালী মুখার্জী, Sydney

অনেকদিন পরে আজ সমুদ্রের ধারে এসেছি। শহর থেকে বেশ কিছু দূরে বলে এ জায়গাটা এখনো জনসমুদ্রে কিল বিল করেনা। নিজের পছন্দমতো জায়গা খুঁজে বসা যায়। সামনে অসীম সমুদ্র, পেছনে উঁচু উঁচু পাথর আর মাঝখানে বালির চর যাকে বলে 'বীচ'। ভাল মাছ ধরা পড়ে এখানে। এখনো বেশী কিছু বেলা হয়নি কিন্তু কয়েকজন ছেলে এর মধ্যেই বসে গেছে নানা আকারের ছিপ নিয়ে। মাছ ধরে রাখবার বালতি, কৌটোতে কুচো মাছ, সবকিছু চারদিকে ছিটিয়ে আছে। কিছু ছোটো কাঁকড়া নিজেদের খেয়াল খুশীমতো ঘোরাফেরা করছিল, এসব ব্যাপার দেখে তাড়াহুড়ো করে জলের দিকে দৌড় লাগালো। আমি দেখেশুনে একটা বড় পাথরের তলায় চাদর পেতে ব্যাকপ্যাক থেকে বই আর চশমা বের করে নিয়ে আরাম করে বসলাম। একটি মেয়ে কিছু দূরে বালির চরার ওপর দিয়ে নেমে এসে হাঁটতে হাঁটতে সামনে দিয়ে চলে গেল। ওই দিকে কিছু হলিডে হোম আছে, বোধহয় সেখান থেকেই আসছে। ছিপ ছিপে চেহারা, পরনে লম্বা পাতলা জামা খালি পা। সূর্য্যের আলো পড়ে জামার ভেতর দিয়ে শরীরে প্রতিটি রেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে একটু করুণারই উদ্রেক হলো ওর উদ্দেশ্যের সদব্যবহার হবেনা বলে। ভুল জায়গায় এসেছে, ওকে দেখে 'Hi baby' বলবার বা তাকানোর মতো জনসমাগম এখানে ঠিক হয়না।

আমার জলভীতি আছে তাই সমুদ্রকে আমি ভয় পাই কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে বসে উত্তাল তরঙ্গ দেখতে খুব ভাল লাগে। এপ্রিল মাস, এদেশের শরৎকাল শুরু হয়েছে, বাতাসে হাল্কা ঠান্ডা আমেজ আর পরিষ্কার আকাশ রোদে ঝকঝক করছে। আকাশের নীল রঙের সাথে সমুদ্রের রঙ মিশে এক হয়ে গেছে। দূর থেকে সাদা পালের মতো ঢেউ এসে বালির ওপর গর্জন করে আছড়ে পড়ছে।

ছেলেটির সাথে হঠাৎ-ই পরিচয় হয়েছিল। চাকরী থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে গিয়েছিলাম। বাসে করে অনায়াসেই যাওয়া যায়, হাঁটাপথে আধঘন্টা লাগে। আমার হাঁটতেই ভাল লাগে। সারাদিন বন্ধ ঘরে কাজ করবার পরে খোলা রাস্তায় বেরোলে মাথার জটগুলো যেন অনেক খুলে যায়। গেট দিয়ে বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটেই নজরে পড়লো একটি অল্পবয়সের ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

বয়স হয়তো বছর বারো হবে। পরনে পুরোনো জীনস্, ঢলঢলে কালো টি সার্ট আর পায়ে স্নিকার। মাথার চুল উস্কো খুস্কো, কবে যে চিরুনীর মুখ দেখেছে কেউ বলতে পারবে না। আমাকে দেখে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, ''ষ্টেশনে যেতে হলে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে তুমি জান ?'' লক্ষ্য করলাম ছেলেটির খুবই রুক্ষ মুখ কিন্তু চোখ দুটোতে এখনও ছেলেমানুষের ছাপ। বললাম, ''এই রাস্তা ধরে হাঁটলেই ষ্টেশন পেয়ে যাবে। আমিও ষ্টেশনেই যাচ্ছি, তুমি যদি চাও তো আমার সাথে আসতে পারো।'' ও বললো ''দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অফ ইউ।'' পথ চলতে দু-চারটে কথা বলে জানতে পারলাম ওর দাদু কিছুদিন হল মারা গেছেন, আমার কাজের জায়গার কাছেই একটা বড় cemetery আছে সেখানে তার সমাধিতে ফুল দিতে এসেছিল। ও থাকে Newcastle এ। একটি জানাশোনা ট্রাক ড্রাইভার Newcastle থেকে এদিকেই আসছিল, তার সাথে এসেছে। সে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কথায় কথায় ষ্টেশন এসে গেল কোন প্ল্যাটফরমে গেলে ও যাবার ট্রেন পেয়ে যাবে দেখিয়ে দিয়ে বাই বাই বলে আমি আমার ট্রেন ধরতে দৌড় লাগালাম।

ছেলেটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু ওর সাথে আবার একদিন দেখা হলো। ষ্টেশনে যাবার রাস্তায় একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, ''কেমন আছো ? এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?'' বলল, ''বড্ড রোদ তাই ছায়াতে একটু দাঁড়িয়ে আছি।''

বললাম, ''হ্যাঁ আজকে রোদ বড্ড চড়া তার ওপর তোমার মাথায় কোন ক্যাপও নেই। সাথে জল আছে তো ?''

বলল, ''না'' । ব্যাগ থেকে আমার জলের বোতলটা বের করে ওকে দিয়ে বললাম, ''এটা রেখে দাও ।'' ওর ভালই জল তেষ্টা পেয়েছিল, বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে বেশ কিছু জল খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল, ''thank you, are you going to station, can I walk with you ?'' এই থেকেই শুরু হল আমাদের দুই অসমবয়সীর বন্ধুত্বের সুত্রপাত । জানতে পারলাম ও মাসে বার দুয়েক cemetery তে আসে । প্রথম প্রথম রাস্তাতেই যা কথা হতো তারপরে কখনো রেস্টুরেন্টে কখনো আমার বাড়ীতে ওকে নিয়ে যেতাম । ছেলেটির জীবন যাত্রা সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না । এই অল্প বয়সেই নিজের চারপাশে একটা গন্ডি টানতে শিখে গিয়েছিল যা দিয়ে ও বুঝিয়ে দিত কোন কৌতুহল সুলভ প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে না । কিন্তু আমার সাথে ওর কথা বলতে ভাল লাগত সেটা বোঝা যেত ।

আমার এখনো মনে আছে প্রথম যেদিন ওকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই । দিনটা ছিল শুক্রবার । সারা সপ্তাহের কাজের পর বাড়ী ফিরে একা নিজের জন্য রান্না করবার ইচ্ছে ছিল না । ওর সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল, বললাম, চলো আজ দুজনে মিলে শহরে গিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে আসি ।'' ও তাড়াতাড়ি ওর নিজের জামাকাপড়ের দিকে তাকানোতে আমি বললাম, ''ভাবনার কিছু নেই, কোনো দামী জায়গায় যাব না ।''

রেস্টুরেন্টে পৌঁছে ওকে বললাম, ''তুমি বোধ হয় বীয়ার খাওয়া পছন্দ কর কিন্তু আমার সাথে সফট ড্রিঙ্ক ছাড়া কিছু পাবে না । ও একটু চুপ করে থেকে বলল, ''আমার গ্র্যান্ড পাও তাই বলতো । বলতো মাই ল্যাভ আই নো ইউ ড্রিঙ্ক বীয়ার বাট নট হোয়েন ইউ আর উইথ মি । আমার গ্র্যান্ডপা খুব গরীর ছিল কিন্তু তবু আমাকে বছরে একবার বাইরে খাওয়েতে নিয়ে যেত, পকেট মানি দিত । প্রেজেন্ট দিত । জানো আমাকে আর কেউ কখনো কোথাও নিয়ে যায়নি বা কিছু দেয়নি । হি ইজ দ্য ওনলি পারসন হুম আই লাভড ।''

সেদিন ওখানে বসেই জানতে পারলাম ওর ওই ছোট বয়েসের মস্তবড় জীবন কাহিনী । বছর সাতেক বয়স পর্য্যন্ত ওর মোটামুটি ঠিকই চলছিল । বাড়ীতে ছিল মা, বাবা, নিজে ও এক ছোট বোন । বাবা ট্রাক ড্রাইভার আর মা এক রেস্টুরেন্টে বাসন ধোবার কাজ করত । ও স্কুলে যেত কিন্তু পড়াশুনার চাইতে ছবি আঁকায় মন ছিল বেশী । একদিন ও খেয়াল করল যে বাড়ীতে মা, বাবার প্রায় রোজই কোনো না কোনো কারণে খুব ঝগড়া হচ্ছে । যেদিন রাতে খুব বেশী চেঁচামেচি হতো ও আর ওর বোন নিজেদের ঘরে গিয়ে বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে মনে মনে প্রার্থনা করত ঝগড়া যেন থেমে যায় । একটা অদ্ভুত ভয় যেন ওকে ঘিরে ধরত । কিন্তু সবকিছু আস্তে আস্তে আরো খারাপই হলো । ওর বয়স যখন আট তখন ওর বাবা একদিন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল আর ফিরে এলনা । মা যখন রেগে গিয়ে ওদের মারধোর করত তখন রাত করে বাড়ী ফিরত । ওরা কখনও খেতে পেত কখনও পেতনা । ছোট বোনটা খিদেতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ত ।

একদিন ওদের মা বাড়ীতে ফিরল একটি লোককে সাথে নিয়ে । তার সারা গায়ে উল্কি মুখে দাড়ি আর মাথায় পনিটেল । বললো ওর নাম পল, এখন এখানেই থাকবে । পল কি কাজ করত জানে না তবে সে মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে দু তিনদিন পরে আবার ফিরে আসত । এর বাইরে বাদবাকি সময় ওর কাটে বীয়ার খেয়ে, ঘুমিয়ে আর ওদের দুই ভাইবোনকে মারধোর করে । পাঁচ বছরের বোনকে ওর আট বছরের দুই হাত দিয়ে যতটা সম্ভব আগলে রেখে মারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি । ওর নিজের গায়ে মাথায় এত মারের দাগ ও ব্যথা থাকত যে মাঝে মাঝেই স্কুল কামাই করতে হতো । ওদের মা এসব দেখেও দেখতে পেত না । ওরা অনেক সময় শুনতো পল চেঁচাচ্ছে, ''এই ছেলে মেয়ে দুটোর জন্যে বাড়ীতে বড্ড বেশী খরচ হচ্ছে ওদের বিদায় করা দরকার ।'' আর মা বেশ হেসে সেই কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে । একদিন পলের জন্যে ফ্রিজ থেকে বীয়ার আনতে গিয়ে বোতলটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়াতে এত প্রচন্ড লাথি ও মার খেয়েছিল যে তিনদিন বিছানায় বলের মতো শুয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করেছে কেউ দেখতে আসেনি । এরপরই ও বাড়ী ছেড়ে রাস্তার ছেলে হয়েছে ।প্রথম প্রথম বোনের জন্যে খুব কষ্ট হতো, একদিন খবর পেল বোন মারা গেছে । ওর জানবার দরকার হয়নি, বুঝে নিয়েছিল বোন কিভাবে মারা গেছে ।

খুব সহজভাবে ও সহজগলায় বলা কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়েছি বা টিভিতে দেখেছি, খারাপ লেগেছে কিন্তু মুখোমুখি বসে শুনলে যে কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে ধারণা ছিল

না। সেদিন বাড়ী ফিরে নিজের মনে ঠিক করেছিলাম যতটা সম্ভব চেষ্টা করব ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তবে অনেক সময় দিতে হবে।

ওর টুকরো টুকরো কথা থেকে আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে ও কোনো জুভেনাইল গ্যাঙের হয়ে কাজ করে, বাসস্থান কখনো ভাঙা বাড়ী, রেলওয়ে প্ল্যাটফরমের বেঞ্চ বা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে। ওর দাদু ওল্ড পিপিলস হোমে থাকতেন, তাকেও কখনও ওর জীবন যাত্রার কথা জানায়নি। পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ওকে আবার জেলে পাঠাবার ইচ্ছে ছিলনা তাই সব বুঝেও চুপ করেছিলাম। আমার বৃদ্ধা প্রতিবেশীনি মাঝে মাঝে বলতেন ''একটা রাস্তার ছেলেকে এনে তুমি বাড়ীতে ঢোকাও দেখবে একদিন নিজের দল নিয়ে এসে তোমাকে খুন করে যাবে।'' এ ধরনের চিন্তা যে আমার মাথাতেও আসেনি তা নয় কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হতো, একটু বিশ্বাস করে দেখতে ক্ষতি কি।

ছেলেটাকে একদিন আমি বলেছিলাম, ''তুমি সবসময় আমার সাথে দেখা করতে আসো, তোমার ঠিকানা দাও মাঝে মাঝে আমি তোমার ওখানে আসব।'' ও বলল ''না না তা হয়না।'' আমি বললাম, ''কেন হয়না ?'' বললো ''তোমার ধারণা নেই আমি কি ভাবে থাকি তুমি ওখানে ঢুকতেই পারবেনা। তুমি যদি চাওতো আমি তোমার সাথে কম দেখা করতে আসবো।'' কথাটাকে আমি আর বাড়তে দিইনি।

ওর মাছ ধরায় ছিল দারুণ সখ। আমি ওকে বলেছিলাম, ''ছোটবেলায় আমিও মাছ ধরেছি কিন্তু এখন বোধহয় আর পারব না। তুমি আমায় দেখিয়ে দেবে ?'' শুনে পরম উৎসাহ ভরে বলেছিল সামনের রবিবারেই ও আমাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। সত্যি সত্যিই তার পরের রবিবারে মাথায় টুপি হাতে ছিপ ও খাবারের ব্যাগ নিয়ে আমরা বেরোলাম ট্রেনে বাসে চড়ে একটা জায়গার উদ্দেশ্যে যেখানে লোক কম আসে বলে ভাল মাছ পাওয়া যায়। অবশ্য সেদিন মাছ ধরার চাইতে জলে ভিজে হৈচৈ করা হয়েছিল অনেক বেশী। ওকে মাছ ধরতে শিখিয়েছিল ওর দাদু। তিনি আরও বলেছিলেন, ''আমি যখন থাকবনা দুঃখ কোরোনা, সমুদ্রের সামনে এসে বসে শুনতে পাবে ঢেউরা আছড়ে পড়ছে আর বলছে, 'আমি আছি, আমি আছি' তুমি জানবে আমি ওর মধ্যেই আছি।''

সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে ওকে Newcastle যাবার ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব বলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম। ও হঠাৎ বলে উঠল, ''আমি সামনের সপ্তাহে তোমাকে Newcastle এর একটা খুব ভাল সী বিচে নিয়ে যাব ওখানে আমি প্রায়ই যাই। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'' ট্রেনে উঠেও প্রায় বন্ধ হবো হবো দরজার ফাঁক দিয়ে আবার চিৎকার করে বললো, ''তুমি কিন্তু তৈরি হয়ে থেকো, আমি খুব সকাল সকাল আসব।''

সেদিন আমি খুব সকাল বেলাতেই ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। জামা কাপড় বদলে ঘরের আলো জ্বেলে আমি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিজের মনে জানলাম ছেলেটার সাথে আমার আর কোনোদিনই দেখা হবে না। একটা ছোট বারো বছরের জীবন শেষ হয়ে গেল, কিছু জানলাম না, কিছু করতে পারলাম না।

নিজের অজান্তেই একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চমকে তাকিয়ে দেখি বেলা পড়ে এসেছে। আশে পাশের লোকজনও অনেক কমে গেছে। এবার আমায় বাড়ী ফিরতে হবে। আস্তে আস্তে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সমুদ্রকে আর একবার দেখে রাস্তার দিকে বাস ধরতে রওনা হলাম। হাঁটতে হাঁটতে কানে এলো সমুদ্রের ঢেউ বলে চলেছে, ''আমি আছি, আমি আছি''।

ছোটবেলায় হাতেখড়ি হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' দিয়ে। সেই থেকেই বাংলা ভাষার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবচাইতে প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ও বনফুল। পেশায় ছিলাম লাইব্রেরিয়ান, সিডনী ইউনিভার্সিটিতে; এখন অবসর নিয়েছি। দেশ বিদেশ বেড়াতে খুব ভাললাগে। ভাললাগে হাজার হাজার বছরের পুরানো শহর ও তার স্থাপত্যশিল্প দেখতে। বাগান করা আমার খুব প্রিয় কাজ আর তার সাথে পশু-পাখীদের খাওয়ানো ও তাদের সাতে ভাব জমানো।

বিপন্ন শৈশব

পিয়ালী গাঙ্গুলী, Kolkata

পায়েস টা নাড়তে নাড়তে মেধা ভাবল একবার ঈশিতাকে ফোন করে দেখি কখন আসবে । তারপর ভাবল থাক, ছেলের জন্মদিনের পায়েস, কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে পুড়ে যেতে পারে । দিনের বেলাটা পুরো বাঙালি মতে ডাল, ভাত, শুক্ত, পাঁচরকম ভাজা, মাছ, পায়েস এসব করে দেবে । রাতে সব বাইরে থেকে অর্ডার করা । ঋজু এসবে খুশি নয় । আজকাল নাকি কারুর এভাবে বাড়িতে জন্মদিন হয় না । ওর বন্ধুদের সবার জন্মদিনে হোটেলে পার্টি হয় । ঋজুও অনেক বায়না করেছিল । মেধা বা অপূর্ব কেউই রাজি হয়নি । ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ''অন্যরা কে কি করে তাতে আমাদের কি ? আমরা আমাদের মত করে পালন করব । সবকিছু কি লোকের দেখাদেখি করতে হবে''?

এসবে ছেলের মন ভরে নি । স্কুলে আর ওর 'প্রেস্টিজ' থাকবে না । মা বাবা যেন ইচ্ছা করেই এসব করে । সবসময় বন্ধুদের কাছে ওকে লজ্জা পেতে হয় । ওর বন্ধুরা 'ভ্যাকেশনে' 'ফরেন ট্যুর ' করে আর ওরা প্রত্যেকবারই ভারতবর্ষের মধ্যেই কোনো জঙ্গল, হিল স্টেশন নয় সি বিচ । সেই কবে একবার মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর গেছিল । ব্যাস, ঐ শেষ । কতবার হংকং, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যান হয়, তারপর সেসব প্ল্যানই থেকে যায় ।

ঋজুর মনে একটা 'ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স' ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে । পড়াশুনোয় ক্লাসের ফার্স্ট বয় হলেও বাকি সবকিছুতেই যেন পিছিয়ে । বন্ধুরা সবসময় 'ব্র্যান্ডেড' জামা, জুতো পরে, ওদের জন্মদিনে মা বাবারা দামি ঘড়ি, ট্যাব এসব গিফট করে । ঋজুর মা এখনো সেই একঘেয়ে গল্পের বই নয় খেলনা দিয়ে চলেছে । কিছু চাইলেই হল, মায়ের সেই এক ডায়লগ ''ঋজু আমরা মধ্যবিত্ত, তোমার বন্ধুদের সাথে তুলনা করলে আমাদের চলবে না । নিজেরটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শেখ ।'' এইসব জ্ঞান শুনতে ঋজুর ভালো লাগেনা । তাই এবার ও সাফ বলে দিয়েছে জন্মদিনে ওর স্কুলের বন্ধুদের 'ইনভাইট' করার দরকার নেই । মেধা ব্যাপারটাকে বেশি পাত্তা দেয়ার প্রয়োজন মনে করে নি । ওরা ওদের মত করে জন্মদিন পালন করবে, দরকার নেই অত বড়লোক বন্ধুদের ।

রান্নাবান্না প্রায় শেষ । এবার ঘরদোরগুলো চট করে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে । ঋজুর গল্পের বইয়ের তাকে গুছাতে গিয়ে টেস্ট কপিগুলো চোখে পড়ল । গল্পের বইয়ের মধ্যে গোঁজা । ঋজু তো বলেছিল টেস্ট কপি এখনো বেরোয় নি । অঙ্কেতে বেশ কম পেয়েছে । অনেকগুলো ভুল করেছে । সবকটাই কেয়ারলেস মিসটেক । ইংলিশটাতেও একটু কমই পেয়েছে । গ্রামারে ভুল । নির্ঘাত সেই হড়বড় করতে গিয়ে । সায়েন্স আর এস এসটি তে ভালো পেয়েছে । খাতাগুলো দেখে মেধা চেঁচাল ''ঋজু এদিকে এসো'' । ঋজু টিভি দেখা ছেড়ে ওঠার কোনো লক্ষণও দেখাল না । বড্ড ধ্যাটা আর অবাধ্য হয়ে উঠছে ছেলেটা দিনদিন । নিজেই রেগে গড় গড় করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে মেধা খাতাগুলো ঋজুর মুখের সামনে ধরল । ''এগুলো কি ? তুমি যে বলেছিলে টেস্ট কপি বেরোয় নি ? মিথ্যে কথা বলতে কোত্থেকে শিখলে ?'' ঋজুর স্পষ্ট উত্তর ''তোমার থেকে'' । এরকম একটা উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলনা মেধা । চোখ কপালে তুলে ছেলেকে প্রশ্ন করল ''আমার থেকে ? আমি মিথ্যে কথা বলি ?'' ঋজুও ততধিক জোর গলায় বলল ''হ্যাঁ বলোই তো'' । মেধা প্রায় চিৎকার করে উঠল ''কি মিথ্যে বলেছি রে আমি'' ?

সোজা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ক্লাস ফোরের ছেলে বলল ''তুমি আমায় বলেছিলে তুমি আর বাবা সিদ্ধিবিনায়কের গণেশের ইঁদুরের কানে প্রে করেছিলে, আর তাই গনুদাদা আমায় তোমার পেটের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল । ওখানে আমি কিছুদিন খেলা করেছিলাম, তারপর একদিন সেভেন হিলসে ডক্টর পাণিকার আমায় তোমার পেট কেটে বার করে তোমার কোলে দিয়ে দিল । আসলে তো গড বা গণু দাদা আমায় পাঠায় নি । তুমি আর বাবা সেক্স করেছিলে বলে আমি হয়েছি । কথাগুলো শুনে মেধার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল । মনে হল এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে । প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল

''তোমাকে কে বলল এসব কথা ?'' ''অংশুমান আর প্রাঞ্জল বলেছিল আর রোহনের বার্থডে পার্টিতে ওর ট্যাবে তো আমরা ছবিও দেখেছি।'' মেধার সারা শরীর কাঁপছে। কি বলবে বা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ঋজু তখনও বলে চলছে ''তুমি আমায় আরো মিথ্যে কথা বলে এসেছো। বাবা আর আঙ্কলরা পার্টিতে যেগুলো খায় তুমি বলতে এগুলো বড়দের কোল্ড ড্রিঙ্ক খুব ঝাল । ওগুলো আসলে হুইস্কি। এলকোহল বলে, খেলে নেশা হয়। আমি ইন্টারনেটে সব পড়েছি ''। নেহাত আজ ওর জন্ম দিন বলে কথা, নইলে মেধা ঠাস করে দুটো চড় লাগিয়ে দিত ঋজুর গালে।

কোনোমতে নিজেকে সামলে ঘরে চলে গেল মেধা। দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। জীবনে এত বড় আঘাত মেধা কখনো পায় নি। বাবা মারা যাওয়ার সময়ও নয়। চাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে আছে ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করবে বলে। ছোট থেকে গল্পের বই পড়ে শোনানো, ভালো ছবি, ভালো সিনেমা দেখানো, এক সুন্দর নির্মল জগৎ ছেলেকে তৈরি করে দিতে চেয়েছিল মেধা। কত কম বয়সেই কত জিনিস কত সরল ভাবে ঋজুকে শিখিয়ে দিয়েছিল। আজ যেন সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছেলে কি আর কোনোদিন ওকে ভরসা করবে ? প্রযুক্তির ছোবল নষ্ট করে দিল ওর ছেলের শৈশব। অঝোরে কেঁদে চলেছে মেধা। ছেলের কাছে মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হওয়ার দুঃখ না কি ছেলের শৈশব নষ্ট হয়ে যাওয়ার দুঃখ, মেধা জানে না। সত্যি আজকাল সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করা কি কঠিন কাজ। একেকজনের একেক সমস্যা। ঈশিতার যেমন। টাটা ইন্টারেক্টিভ সার্ভিসেসের অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে চলে আসতে হল। মেধার ছোটবেলার বন্ধু ঈশিতা। চিরকালই মেধাবী। ছেলের জন্য কেরিয়ার ব্রেক নিয়ে বসে ছিল। ছেলেটাও হয়েছিল তেমনি তুখড়। ওইটুকু বাচ্চা, কি না জানে। সাংঘাতিক বুদ্ধিমান আর তেমনি দুষ্টু। সারাক্ষণ মাথায় কোনো না কোনো দুষ্টুমি ঘুরছে। আর অনর্গল কথা বলত। যেখানেই যেত সকলকে মাতিয়ে রাখত। মেধাদের বাড়ি এসেছে অনেকবার। ঋজুদাদার সাথে বেশ ভালোই জমত। এতদিন বাড়িতে বসে থাকার পর অপ্রত্যাশিতভাবে এত ভালো একটা চাকরি পাবে ঈশিতা নিজেও ভাবে নি। পোস্টিং ব্যাঙ্গালোর। অরণ্যকে যখন বলল কথাটা অরণ্য বলল ''তুমি কি এখন ছেলেকে ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে চাকরি করবে নাকি ?'' ''না তা কেন, তুমিও ট্রান্সফার নিয়ে নাও না'' আদুরে গলায় বলল ঈশিতা। অরণ্য সাফ জানিয়ে দিল ওর পক্ষে এই মুহূর্তে নিজের কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করা সম্ভব নয়। ঈশিতারও জেদ চেপে গেল। ক্লাস ওয়ানে পড়া ছেলেকে নিয়ে একাই পাড়ি দিল ব্যাঙ্গালোর।

কোম্পানির দৌলতে কোনো কিছুই অসুবিধে হয়নি কিন্তু সমস্যা হল তাতানকে নিয়ে। অত প্রাণোচ্ছল, দুষ্টু ছেলে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেল। শান্ত বলা ভুল, নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিল। অত অনর্গল কথা বলা ছেলে কারুর সাথে কথা বলে না, মেশে না, এমনকি টিভির নেশাটাও চলে গেছে ওর স্কুল টিচারের সাথেও কথা বলেছে ঈশিতা। উনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তাতান ব্রাইট স্টুডেন্ট, ও ঠিক এডজাস্ট করে নেবে। এইটুকু বাচ্চা, নতুন পরিবেশে একটু সময় তো লাগবেই।

একটু একটু করে ছমাস কেটে গেল। ছেলের কোনরকম উন্নতি না দেখে বাধ্য হয়ে ব্যাঙ্গালোরের নামী চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্টের দ্বারস্থ হতে হল। মা ছেলের সাথে আলাদা করে কথা বলে ডঃ কৃষ্ণমূর্তি যা বললেন তার সারমর্ম হল তাতান ওর বাবাকে মিস করে আর বাবার অভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এর একটাই সমাধান, একসাথে থাকা, আর কোনো বিকল্প নেই। এত ছোট বয়স থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে ভবিষ্যতে আরো নানারকম মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ঈশিতার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তাতানের ভিতরে এত কিছু চলছে ও কোনোদিন টের ও পায়নি। রোজ রাতেই অবশ্য বাবাকে ফোনে একই প্রশ্ন করত ''বাবা তুমি কবে আসবে ?'' সেই ছোট থেকেই বাবা পাশে না শুলে তাতানের ঘুম হত না। সারাদিন ভূত প্রেত, রাক্ষসের গল্প শুনত আর রাত হলেই জিজ্ঞেস করত ''বাবা শক্তিশালী তো ?'' কেউ আমায় ধরতে এলে বাবা তাকে মারবে তো ?''

সব কিছু শুনে অরণ্য বলটা ঈশিতার কোর্টেই ঠেলে দিল। বলল ''দ্যাখো কি করবে''। একবারও নিজে ট্রান্সফার নেওয়ার কথা বলল না। ঈশিতাই পারল না। হাজার হোক, মা তো। ছেলের শৈশব, ছেলের ভবিষ্যৎ সব নষ্ট করে স্বার্থপরের মত নিজের কেরিয়ারটা আর করতে পারল না। ফিরে আসতে হল কলকাতায়। তবে এটাই আনন্দের কথা যে তাতান আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। আজকে এলে ভালো বোঝা যাবে। ভাবতে ভাবতে মেধা ঈশিতার

নম্বর টা ডায়াল করল ''কি রে কখন আসছিস ? দুপুর দুপুর চলে আয়, জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে''। দুপুরে ভুরিভোজ করে অবশ্য ঋজুবাবুর মন একটু ভরেছে। মা ঠিক ততটা খারাপ নয়। তারপর যখন শুনল তাতান আসবে নিজেই সব খেলনা টেলনা বার করে রেডি করে রাখল। মেধারও মনটা খানিক শান্ত হল। ছেলের মনটা তাহলে একেবারে বিষিয়ে যায়নি, এখনো আশা আছে।

দুপুরে মণি বাসন মাজতে এলে মেধা বলল ''এই আজ ঋজুর জন্মদিন, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের নিয়ে আসিস। রাতে এখানেই খাবি''। মণির বর ধনঞ্জয় আগে ওদের ফ্ল্যাটে কেয়ারটেকারের কাজ করত। ফ্ল্যাটেরই একজন ওকে 'লার্সেন এন্ড টুব্রতে' কন্ট্রাক্টে জেসিবি চালানোর কাজে ঢুকিয়ে দেন। বেশ ভালোই মাইনে। কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ সে দুম করে আরেকটা বিয়ে করে এনে হাজির। কিছুদিন সহবস্থান, তারপরেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মণিকে বিদায় করে দিল। সেই থেকে মণি লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে দুই মেয়েকে মানুষ করছে। কত আর বয়স হবে, বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। মেয়েগুলো সকালে সরকারি স্কুলে পড়তে যায় আর বাকি সময় মায়ের হাতে হাতে কাজ করে। রোজ দুবেলা ভালো করে খাওয়াও জোটে না। মেয়েগুলো বেশ চালাক চতুর। ধনঞ্জয় এভাবে সংসারটা না ভাঙলে মেয়েগুলোর অনেক ভালো ভবিষ্যৎ হতে পারত।

সন্ধ্যেবেলা বৃহৎ কোনো পার্টি হয়নি, নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। হাতে গোনা কয়েকজন নিকট আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব আর ফ্ল্যাটের কয়েকটা বাচ্চা। হই হই করে ভালোই কেটে গেল সন্ধ্যেটা। ঋজুরও বোধহয় খারাপ লাগেনি। মেধা আর আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। ওর মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। চারিপাশে শিশুদের কতরকম সমস্যা। নিজের ছেলের কথা, তাতানের কথা, মণির মেয়েদের কথা, সবার কথা ভাবছে। আরেকজনও আছে। নীচের ফ্ল্যাটের কুহু। শুনেছে ওর মা সাইকায়াট্রিক পেশেন্ট। সিভিয়ার অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। নিজের ছুঁচিবাই নিয়েই ব্যস্ত। মেয়েকে ঠিকমত রান্না করে বা টিফিন করেও দিতে পারেন না। কুহু নিজেই ঋজুদের কাছে দুঃখ করেছে ওর মা ওকে আদর করে না, ছোঁয় না, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। মায়ের খাট, বিছানা, বাসন পত্র, সাবান, শ্যাম্পু, পেস্ট সব আলাদা। ওদের ছোঁয়ার অধিকার নেই। বাবা ভালোবাসেন কিন্তু কহুর মায়ের অভাব মেটে না। একদিন নাকি কান্নাকাটি করে বলেছে ওর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেলেও ভালো। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি রাস্তায় বাস চাপা পড়ে মরে যায়। তাহলে হয়ত পরের জন্মে ভগবান ওকে ভালো মা দেবেন।

ঋজু ঘুমিয়ে পড়েছে। সদ্য পাওয়া লাল রেসিং কার টা প্রায় বুকে জড়িয়ে। মেধার মনটা একটু ভারাক্রান্ত। চারিপাশের বাচ্চাগুলো ভালো নেই। এইভাবে ওদের শৈশব হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। কিছু একটা করতে হবে।ঋজু তো বড় হয়ে যাচ্ছে। সামনেই ক্লাস ফাইভ। মায়ের ওপর নির্ভরতা আরো কমবে, ও হাতে আরও অনেক সময় পাবে। আচ্ছা, একটা এন জি ও খুললে কেমন হয় ? শুধু শিশুদের নিয়ে কাজ করবে, শিশুদের সমস্যা নিয়ে। মিডিয়ার প্রপাগ্যান্ডা বা বিদেশী এড, ওসব চাই না। নিঃশব্দে কাজ করবে, যথার্থ কাজ। বন্ধুবান্ধব মহলে তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, মনোবিদ, উকিল সবই তো আছে। সবাই একটু একটু যদি সাহায্য করে। দ্বিধা কাটিয়ে অপূর্বকে কথাটা বলেই ফেলল। অপূর্ব স্পষ্ট কথার মানুষ। শুনে বলল ''যদি মনে কর করবে, কর। ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করো না। এগিয়ে চল, সামনে পথ ঠিক খুলে যাবে আর ভালো মানুষের সাহায্যও ঠিক পেয়ে যাবে।'' সারাদিন পরে মেধার মনটা একটু শান্ত হল। রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। সামনে অনেক কাজ।

পিয়ালী গাঙ্গুলী : পেশায় শিক্ষিকা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ। বাড়ি কলকাতা। তিন বছরের এক দস্যি ছেলের মা। বই পড়তে, লিখতে, ছবি আঁকতে, বেড়াতে যেতে, সাঁতার কাটতে আর ঘুমোতে ভালোবাসি। ভীষণ লোভীও। আর ভালোবাসি স্বপ্ন দেখতে। মস্তিষ্ক কম চলে (বিশেষ কিছু নেই ওই জায়গাটায়), সবকিছুই হৃদয় দিয়ে করি। আর ঠকি। তাও আবার করি।

সুর ঝঙ্কার

অনিতা মুখোপাধ্যায়, Kolkata

মনের মধ্যে উঠছে কেন
অজানা এক ঢেউ
জানি না কোথায় ভাসিয়ে নেবে
সুখ না দুঃখের সমুদ্দুর ।
সুখের সমুদ্রে ঠাঁই পাওয়া
সে তো সহজ কথা নয়
দুখের সমুদ্র সে তো সীমাহীন
অনায়াসে হারিয়ে যাওয়া যায়
অজানা এক দুরু দুরু রব
বুকের মধ্যে যে স্তব্ধতা এনে দিচ্ছে
ভয়ে ভাবনায় ছোট্ট হৃদয়
থরথরিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে
মৃদঙ্গে তালে ছন্দ মিলিয়ে
হঠাৎ একি এক অপূর্ব সুরলহরী
আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে
পৃথিবীর সর্বত্র মূর্ছনায় দিচ্ছে ভরি
অতি সহজে সুখের সাগরে
ভেসে চলে মন প্রসন্ন হৃদয়ে
নেই কোন ভয় নেই সংশয়
মিষ্টি সুরের ঝঙ্কার পূর্ণতায় দিয়েছে ভরি ।।

অনিতা মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা ও আবৃত্তি আর গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল । বেথুন কলেজের স্নাতক অনিতা ''সৌরভ সঙ্গীতায়ন'' থেকে ''সঙ্গীত ক্রিয়া বিশারদ'' উপাধিতে সম্মানিতা হন । সঙ্গে চলতে থাকে কবিতা ও গল্প লেখা । বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''বিরহী'' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে । গল্প সংকলন ''দুরন্ত জীবন'' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে, ''ঐশ্বর্য'' তাঁর নবতম কাব্য সংকলন যা স্বীয় দ্যুতিতেই কাব্য রসিকের নজর কাড়বে ।

পর্যালোচনা

স্পটলাইট, ২০১৭, অ্যান আরবরে নাট্যোৎসব

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

২৪ শে জুন, ২০১৭, শনিবার। ঝকঝকে উজ্জ্বল একটি দিন। শিকাগো থেকে প্রায় ঘন্টা চারেক গাড়ী চালিয়ে যখন অ্যান আরবরে উইনিভার্সিটি অফ মিশিগানের টাওসলি অডিটোরিয়ামের পার্কিং লটে পৌঁছলাম তখন সময় প্রায় বেলা সাড়ে বারটা। শাড়ী পরা মহিলারা গাড়ী থেকে নামছেন, উঠছেন। হঠাৎ করে মনে হতে পারে বাঙালীর প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো এসে পড়েছে বুঝি। কিন্তু বাঙালী মাত্রেই জানেন জুন মাস আনন্দময়ীর আবাহনের মাস নয়। উৎসব বটে, তবে পুজো নয়। এ হল সংস্কৃতির উৎসব। MILITS আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের এটি প্রথম দিন।

MILITS-মিশিগান লিটারারি এ্যান্ড থিয়েট্রিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এ বছর। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সাহিত্য, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের ভৌগোলিক বেড়া ভেঙে দেওয়া। সেই চিন্তা থেকে আয়োজন এই নাট্যোৎসবের। আমারিকার বিভিন্ন শহর শিকাগো, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, ডেট্রয়েট, এ্যান আরবর থেকে যেমন শখের নাটকের দল এসেছিল তেমনই এসেছিল থিয়েটার ওয়ার্কশপের মতো কলকাতার পেশাদার নাটকের গ্রুপ। দুদিন ধরে পর্যাক্রমে আটটি বিভিন্ন স্বাদের নাটক মঞ্চস্থ হল। নাটকের মধ্যে মধ্যে বিরতি। সেই সময়ে উপভোগ করা গেল অভিনীত নাটক বিষয়ে নাট্যপরিচালকদের নানা অভিমত। এছাড়াও দুদিনই অনুষ্ঠান শুরু হয় নাটকের গানের মনোজ্ঞ পরিবেশনের মাধ্যমে।

মাইলিটসের সভাপতি, শ্রী আনন্দ সেন, তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'মাইলিটসের জন্ম একটা স্বপ্ন থেকে। যে স্বপ্নে মিশে থাকে এই বিশ্বাস যে ভাল সাহিত্য, নাটক, মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের একটা সেতু।' এই সেতু একদিন দেশ, ভাষা আর ধর্মের ব্যবধান পার হয়ে পৌঁছে যাবে বিশ্বের মানুষের দরবারে। মাইলিটসের এই আশা আর স্বপ্নের সামিল হলাম আমরা যারা এই নাট্যোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম তারা সকলেই। স্পটলাইটের চেয়ারম্যান, শ্রী জয়ন্ত হাজরার বক্তব্যেও শোনা গেল একই রকম উষ্ণ অভ্যর্থনার সুর। মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হল কলকাতার শিল্পী জয়ন্ত মিত্রের বাংলা নাটকের গান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে। কোনরকম যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়া খালি গলায় তিনি গাইলেন বেশ কিছু পুরনো দিনের বাংলা নাটকের গান। খালি গলায় এইরকম গান গাওয়া আজকাল প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। জয়ন্তবাবুকে সার্থক সহযোগিতা করলেন স্থানীয় শিল্পী কাজরী দে। নাটকের গান আর তার সঙ্গে পুরনো দিনের নাটকের প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে মন যখন নাটকেই মজে গেছে তখন উপস্থাপিত হল নাট্যোৎসবের প্রথম নিবেদন সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখা নাটক 'দুর্ঘটনা'। পরিবেশন করলেন নেব্রাস্কা থেকে আসা নাট্যদল রূপকথা। নাটক নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেন অলক ধর। নাটকে চরিত্র মাত্র দুটি। সহ অভিনেতা পিনাকী মন্ডলের নির্বাক অভিনয়। সংলাপ সব একজনের। তাই এটিকে এক অর্থে একাঙ্ক নাটক বলা চলে। অভিবাসী জীবনের একাকিত্ব আর প্রতিযোগিতার শিকার নায়ক। তার পরিণতি করুণ। অনুষ্ঠানের প্রথমেই এরকম একটি নাটক দর্শকদের খানিকটা ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই প্রশ্ন জাগে একেবারে শুরুতেই এই নাটকটি পরিবেশনের বিশেষ কোন কারণ ছিল কিনা।

তারপরের নিবেদন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণ হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক 'একটি অবাস্তব গল্প।' পরিবেশনায় শিকাগো নাট্যগোষ্ঠী। নাটকের কাহিনি দর্শকদের অনেকের কাছেই ছিল পরিচিত। নাটকীয়তার গুণের জন্য নাটকটি বহুলভাবে অভিনীত। পরিচালক দেব হাজরা চেষ্টা করেছেন চেনা নাটকেও একটি নতুন আঙ্গিক যোগ করতে। সেই চেষ্টা ফুটে উঠেছে নাটকের শুরুতে ঘোষকের ঘোষণায়। তারপর বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে। সত্য শুভজিৎ ঘোষালের আবহ সঙ্গীত রচনার মধ্যেও সেই নতুনত্ব আনার চেষ্টা লক্ষণীয়। নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা শাশ্বত বার্তা থাকার জন্য সেই চেষ্টা উৎরেও গেছে সফলভাবে। নাটকের চরিত্ররা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন। দক্ষ পরিচালনা ও কুশীলবদের অভিনয় কুশলতার জন্য চেনা নাটকটি আরও একবার দেখতে ভাল লাগল। নিজের শহরের

পরিবেশনা বলে পক্ষপাতদুষ্ট অভিমত যে এটা নয় তার প্রমাণ পেলাম যখন নাটকের শেষে অন্যান্য শহর থেকে আসা দর্শকরাও নাটকটির প্রশংসা করছিলেন।

সেই সন্ধ্যার পরের নিবেদন মাইলিটসের নাটক 'রণাঙ্গন'। নাটকের বিষয়বস্তু খুব বেশী রকমের প্রাসঙ্গিক। ফোটোগ্রাফার রোমা ক্যামেরা নিয়ে ছুটে যায় এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে। এইরকম এক যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়ে সে ফিরে আসে তার প্রেমিকের কাছে। যুদ্ধের হিংসার বলি হয় তার গাইড সাজিদ। কিন্তু তাকে ভুলতে পারে না রোমা। তার নিজের জীবনে এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সাজিদ। রোমা আর তার প্রেমিক পৃথ্বী যে পত্রিকার হয়ে কাজ করে তার সম্পাদক দেখতে আসেন রোমাকে। সঙ্গে আসেন তাঁর বান্ধবী মন্দিরা। আপাত দৃষ্টিতে অগভীর মনের এই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত রোমার কাজকে চ্যালেঞ্জ জানায়। রোমাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, 'আহত, রক্তাক্ত জীবনের ছবি না তুলে তাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়াই উচিৎ কাজ নয় কি ?' তার উত্তরে রোমা যদিও বলে যে ক্যামেরা শুধু জীবনের ছবিই তুলতে পারে, জীবন পাল্টাতে পারে না, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টে যায়। তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে সে আবার যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। তবে এবারে আর যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনের আলোকচিত্রী হয়ে নয়, এবারে সে যায় যুদ্ধে আহত নারী ও শিশুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। নাটকের সব চরিত্রই নিজের নিজের ভূমিকায় পারদর্শিতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে মন্দিরার ভূমিকায় দেবলীনা সুরের অভিনয়। রোমা ও পৃথ্বীর ভূমিকায় মালা চক্রবর্তী ও আনন্দ সেনের অভিনয় অতি স্বচ্ছন্দ। মন্দিরার স্বামী ও রোমা আর পৃথ্বীর বস-এর ভুমিকায় জয়ন্ত হাজরার অভিনয় যথাযত। নাটকের আবহসঙ্গীত রচনায় জয়ন্ত মিত্রের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গতিময়তার গুণে নাটকটি আগাগোড়া দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখতে সফল হয়েছে।

বেশ সিরিয়াস এই নাটকটির পরে স্বাদবদলের পালা। দিব্যেন্দু পালের রচনা ও পরিচালনায় 'বাড়ীটা তুই আছিস কেমন' হল একটি হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা কলকাতার বাঙালীদের কাছে পৌঁছে যায় বিষয়বস্তুর আবেদন। কলকাতাবাসী বিপত্নীক এক বৃদ্ধ পিতা আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রবাসী মেয়ের কাছে বেড়াতে আসেন। আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মেয়ের জন্য প্রাণের আকুলতা। মেয়ে তার ব্যস্ততার জীবনেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায় বাবাকে মানসিকভাবে ভাল রাখার। চেষ্টা বাবাও করেন নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার। কিন্তু মাঝেমাঝেই তাঁর মন উথালপাথাল হয় ফেলে আসা ভবানীপুরের বাড়ীটির জন্য। মেয়ের বাড়ীর আরামস্বাচ্ছন্দ্যেও প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে তাঁর। মনে হয় তিনি সোনার খাঁচায় আটকে পড়েছেন। নাটকের শেষে টেবিলে বাবার আঙুল আটকে যাওয়াটা তারই প্রতীকী। কোন কোন জায়গায় একটু অপ্রয়োজনীয় রকমের দীর্ঘ মনে হয়েছে নাটকটি। বিষয়বস্তুর আবেদন ছিল বলে খুব সহজেই দর্শক একাত্ম হতে পেরেছেন নাটকটির সঙ্গে। বাঙালী শ্বশুরের দক্ষিণ ভারতীয় জামাতার ভূমিকায় অরিন্দম ঘোষের অভিনয় মনে দাগ কাটে। সারা নাটকে এই বন্দীত্বের বিষয়টির ইঙ্গিত বেশ সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সেটে একটি ঘড়িও একটা জায়াগাতেই থেমে ছিল।

এই নাটকের শেষে পেলাম নৈশাহারের বিরতি। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট দামে ডিনার প্যাকেটের সুব্যবস্থা ছিল। নাট্যোৎসবে সমাগতদের এলোমেলো জটলা টেবিলে টেবিলে। কোথাও অভিনীত নাটকের জোরদার আলোচনা, কোথাও আবার পরে যে সব নাটক অভিনীত হবে সেসব সম্বন্ধে নানারকম জল্পনা কল্পনা। স্থানীয় একজন শাড়ী বিক্রেতা শাড়ীর পসরা নিয়ে বসেছেন দেখলাম। ছিল কসটিউম জুয়েলারীর স্টলও। সব মিলিয়ে বেশ একটা বাঙালী উৎসবের আবহাওয়া।

ফিরে এলাম সেই দিনের শেষ নাটকের আকর্ষণে। কলকাতার রণগ্রুপের নিবেদন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'তখন বিকেল'। পরিচালনা সীমা মুখোপাধ্যায়। নাটকের বিষয়বস্তু বেশ পরিচিত। দুই পরিণত বয়স্ক নারী পুরুষের নতুন করে নিজেদের খুঁজে পাওয়ার গল্প। 'বৃদ্ধ বয়সে নারী পুরুষের বন্ধুত্ব, খাদটুকু বাদ দিয়ে সোনাটুকু চাই' — নাটকের এই সংলাপের মধ্যে বিষয়বস্তু ধরা আছে। কিন্তু অসাধারণ অভিনয়ের গুণে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকের শেষে মন ভরে গেল। মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগিণী উমা রায়ের ভূমিকায় সীমা মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় মনে দাগ কাটে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটির স্বচ্ছন্দ গতি দর্শকদের মুগ্ধ করে। মন ভরে যায়। পরিপূর্ণ মন নিয়ে অডিটোরিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসি পরের দিনের প্রাপ্তির কথা ভাবতে ভাবতে।

পরের দিন, জুন ২৫, ২০১৭। বেশ হাল্কা খুশীর মেজাজ দর্শকদের। দর্শকদের মধ্যে বেশ কিছু আগের দিনের নাটকের কুশীলব ও তাঁদের পরিবারের লোকজন। নিজেদের অভিনয় হয়ে যাওয়াতে আজ তাঁরা নিশ্চিন্ত খানিকটা। আমেরিকার এক রাজ্যের নাট্যপ্রেমীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছে আর এক রাজ্যের নাট্যপ্রেমীর। ভেঙে যাচ্ছে বেড়া। তৈরী হচ্ছে মানসিক মেলবন্ধন। আর এই সেতু তৈরী করাতেই মাইলিটসের সার্থকতা। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক বিচিত্রার পক্ষ থেকে পরিবেশিত মনোজ মিত্রের 'কাকচরিত্র'। 'একটি অবাস্তব গল্প' এর মতো এটিও দর্শকদের সুপরিচিত। এই নিবেদনটির নাট্যরূপ দিয়েছেন ও পরিচালনা করেছেন প্রদীপ্ত ঘোষ। নাট্যকার ব্যোমকেশ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না কি নিয়ে লিখবেন পরের নাটকটি। তাঁর ইচ্ছা নাটকের নায়ক হবে একজন সৎ সাধারণ মানুষ। কিন্তু যাকেই তিনি ভাবছেন খাঁটি, কাক ঘটনাক্রমে উদ্‌ঘাটন করছে তার চরিত্রের একটি অন্ধকার দিক। শেষ পর্যন্ত কাক নাট্যকারকেও তার নিজের জীবনের এক অজানা, অনভিপ্রেত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। নাটকের কুশীলবেরা সকলেই নিজের নিজের চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। তাই আগে অভিনীত হলেও নাটকটি আরও একবার দেখতে ভাল লাগল।

'কাকচরিত্র' নাটকের পরের অনুষ্ঠানে একেবারেই অন্যরকম স্বাদ। দেখলাম রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অবলম্বনে নৃত্যগীতি আলেখ্য 'পঞ্চচিত্রা'। নাচের একটা বড় অংশ যে অভিনয় সে কথা অনেক সময় মনে থাকে না আমাদের। তাই এই নাট্যোৎসবে 'পঞ্চচিত্রা'র পরিবেশনা খুব ভাল লাগল। বেশ নতুন ভাবনা। নাচের সাহায্যে নারীচরিত্রের আশা-নিরাশা, ভয়-ভাবনা, বেদনা-সুখ, প্রেম-অপ্রাপ্তি তুলে ধরা হয়েছে এই musical journey তে। মেয়েদের চিরন্তন অনুভূতির গল্প এ। তাই শতাব্দী পার হয়েও থেকে যায় বিষয়বস্তুর আবেদন। মিশিগানের অক্ষর গোষ্ঠীর নিবেদন এটি। অসাধারণ নাচ, বিশেষ সৌন্দর্যগুণ সম্পন্ন মঞ্চসজ্জা আর উপস্থাপনার অভিনব আঙ্গিকের জন্য এই অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নাচের কোরিওগ্রাফার শ্রেয়সী দে প্রশংসার দাবী রাখেন। বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে প্রত্যেক নৃত্যশিল্পী। এটিও ছিল একটি মন ভরান নিবেদন।

পরের নাটক নিউ জার্সির সুদীপ্ত ভৌমিকের রচনা ও পরিচালনায় 'ঈশ্বর'। প্রযোজনায় নিউ জার্সি তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম বাংলা নাট্যদল একতা। আদতে এটি 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা' এই তিনটি মৌলিক একাঙ্ক নাটকের কোলাজ। কোলাজের প্রথম নাটক ঈশ্বর। স্বামী অতুলানন্দ বেদান্তের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন আমেরিকায়। আপ্লুত ভক্তবৃন্দের এক সমাবেশে হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হন এক বৃদ্ধ দম্পতি আর এক তরুণী। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন অতুলানন্দের মা বাবা আর প্রেমিকা বলে। তাঁদের মধ্যে দিয়ে তিনি মুখোমুখি হন নিজের অতীতের। সে অতীত লজ্জার। সে অতীত তাঁকে তুলে ধরে প্রতারক হিসেবে। বিভ্রান্ত ভক্তদের অতুলানন্দ আশ্বস্ত করেন এই বলে যে তাঁর সম্বন্ধে এইসব অভিযোগ ভ্রান্ত। তবে সত্যি কি ? তিনি নিজেই কি তা জানেন ? জনক রাজার মতো তিনিও সেই এক প্রশ্নের সম্মুখীন হন, 'ইহা সত্য না উহা সত্য ?' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পের টানটান ভাব দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখে। অতুলানন্দের বাবা-মার ভূমিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আলো ও আবহসঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ নাটকটিকে উপভোগ্য করেছে।

পরের নাটক off কেন্দ্রিক, বস্টনের নিবেদন সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী 'খগম' অবলম্বনে 'রাজেশবাবুর অন্তর্ধান'। মূল কাহিনি থেকে নাট্যরূপ অনেকটাই আলাদা। পরিবেশনার অভিনবত্ব থাকলেও নাটকটি ঠিক মনে ছাপ ফেলে না।

দুইদিন ব্যাপী এই নাট্যোৎসবের শেষ নিবেদন ছিল স্বপ্নময় চক্রবর্ত্তীর গল্প অবলম্বনে কলকাতার থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক 'কুশীলব'। কুশীলব কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'কাহিনীর মুখ্য চরিত্র'। নাটকটিতে নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া তুলে ধরা হয়েছে। তার সাথে সাথে তুলে ধরা হয়েছে একটা যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও থিয়েটারের জগতের নানা ওঠাপড়া। নাটকটি দেখতে দেখতে মনে চোখের সামনে যেন খুলে যাচ্ছে এক নকশী কাঁথা। একক অভিনয়ে দর্শকদের অভিভূত করে দিয়েছেন বাংলা নাটকের এখনকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়। বাদল দাসের অসাধারণ শব্দপ্রয়োগ নাটকটিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। দিনটি ছিল রবিবার। পরের দিন থেকে কর্মময় একটি নতুন সপ্তাহের

শুরু । ভিনরাজ্যের বাঙালীরা কেউ কেউ তাই ফিরে গেছেন শেষ নাটকটি না দেখে । তাঁদের জন্য আফশোস আমাদের । আমরা যারা এই নাটকটি উপভোগ করতে পারলাম তারা জানি অন্যরা কতটা বঞ্চিত হল ।

অভিবাসী বাঙালীদের কাছে এই নাট্যোৎসব এক পরম প্রাপ্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই দুই দিন স্থানীয় এক হোটেলে ছিলাম আমি । উদ্যোক্তাদের বিশেষ ধন্যবাদ এই সুযোগটি আমাকে দেওয়ার জন্য । নাট্যোৎসবে যোগদানকারীদের অনেকেই ছিলেন সেই হোটেলে । রাত জেগে আড্ডাও হল অনেক । বিষয় ? অবশ্যই নাটক । তবে সাহিত্য, গান, কবিতা- এসবও বাদ যায় নি । পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে আরও একবার নিজেদের শিকড়ের কাছে ফেরা । এটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি এই নাট্যোৎসব থেকে । আশা করি আগামী বছর আবারও এরকম একটি সুন্দর প্রচেষ্টা উপহার পাব আমরা মাইলিটসের কাছ থেকে । প্রবাসে জীবন সংগ্রামের নানা চাহিদা মিটিয়ে এই নাটকের উৎসবে আমেরিকার যে যে নাট্যগোষ্ঠী নাটক পরিবেশন করেছেন তাঁরা সকলে অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখেন । সত্যিই এ এক অভিনব প্রচেষ্টা মাইলিটসের । আশা করি সকলের ভালবাসা ও সহযোগিতায় ভৌগোলিক সীমানা পার হয়ে আরও নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে মাইলিটসের এই সংস্কৃতির সেতু ।

শিলং-চেরাপুঞ্জি

অর্পিতা চ্যাটার্জী, Omaha

শিলং সম্পর্কে বললে বাঙালি মাত্রেই বলবে 'শেষের কবিতা'-র কথা । আমার কাছে এছাড়াও নারায়ণ সান্যালের 'গজমুক্তা' বা রহস্যের পিছনে ধাওয়া করা প্রৌঢ় কর্ণেল-এর কাহিনী — আসামের জলা জমিতে, ঘাসের জঙ্গলে হাতি বা মাহুতদের জীবনের প্রতি বা মনিপুর-মেঘালয়ের বৃষ্টিধোয়া জলা প্রান্তরের প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরী করেছিল । ২০১১ সালে যখন কোথাও একটা যাবার পরিকল্পনা হলো, তখন আমি শিলং-এর নাম করলাম এবং বাদবাকি সব্বাই একবাক্যে রাজীও হয়ে গেলো । এইবেলা এখানে, এই যাবার কারণ সম্পর্কে দুএককথা বলতে ইচ্ছে করছে ।

২০০৯ বা ২০১০ নাগাদ গোপালনগর — কোলাঘাটের চ্যাটার্জী পরিবার এবং ইন্দা — খড়গপুরের মন্ডল পরিবারের মায়েরা, নিজ নিজ অপোগন্ডদের একবার করে তাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন যে যথেষ্ট হয়েছে, এবার বিয়ে নামক হুজ্জতিটি মিটিয়ে যেন তাদের উদ্ধার করা হয় । কিন্তু অপোগন্ডরা যেহেতু চিরকালই অপোগন্ডই থাকে, তাই তখন সেকথা তারা কানে না নিয়ে গবেষণা এবং প্রেমের নামে সাপ্তাহিক কলকাতা যাত্রা চালিয়ে চললো । শেষে দুপক্ষের বাবারা যখন বললেন, আহা কেন বেচারাদের বিরক্ত করছো ? থিসিসটা শেষ করতে দাও তারপর নয় হবে ওসব । মায়েরা তো রণে ভঙ্গ দিলেন কিন্তু এবার সমস্যা হয়ে গেলো অপোগন্ডদুটির । কারণ থিসিস শেষ হবার পর বিয়ে হবে এমন মারাত্মক শর্ত দিলে তো জীবনে কোনোদিন বিয়ে নাও হতে পারে । শেষে, ২০১১-র মাঝামাঝি দুজনের ল্যাবেই যখন চুড়ান্ত নড়বড়ে অবস্থা, তখন দুজনে যুক্তি করে ঠিক করলাম, কিছুই তো হচ্ছে না কাজের কাজ, তাহলে বিয়েটাই করে না হয় ফেলা যাক । কিছু তো একটা উত্তেজনা, থাকুক জীবনে । লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের নিজের বাড়িতে বলেই ফেললাম এবার বিয়ের কথা শুরু করা যেতে পারে । কারণ, এখন কথা শুরু হলে ঘটনাটা ঘটতে কমপক্ষে আরো আট-নয় মাস । বাঙালি বিয়ে বলে কথা, পাত্র পাত্রী নির্বাচনের অর্বাচীন কাজটি বাদে সব কিছুই পড়ে আছে । এইবার দুই বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো । তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিয়ে নামক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারটায় জড়াতে বুঝি আরো বেশ কিছু বছর সময় নেবে । কিন্তু বাবাদের ওই থিসিস শেষ করার কথায় ভয় পেয়ে দুই মক্কেলের এই পরিকল্পনা । তাতে সম্মতি পেয়ে, এবার আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবলাম, দুই বৈবাহিক পরিবারের প্রথম দর্শন এবং এই প্রাথমিক কথাবার্তা বাড়িতে না হয়ে কোথাও একটু অন্যরকম পরিবেশে হলে কেমন হয় । এতেও সম্মতি পাওয়া গেলো । আগেই বলেছি শিলং-এর নামটা প্রথমবারেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল । ঠিক করেছিলাম, চেরাপুঞ্জি দেখবো তো বর্ষাকালেই দেখবো । সুতরাং, ২০১১-এর অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি শিলং-চেরাপুঞ্জির সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে গেলো ।

সেই মর্মে ১২ই অগাস্ট বিকেলে ভরা বর্ষা মাথায় নিয়ে দুই আসন্ন বৈবাহিক পরিবার বিয়ের প্রাথমিক কথা বলতে চটি-ছাতা-বিছানা-বালিশ-তোরঙ্গ-পানের ডাবর নিয়ে জিভ টিভ পরিষ্কার করে কলকাতায় এলেন । পরদিন কাকভোরে গুয়াহাটির উড়ান । ভরা বর্ষা তো ছিলই, তার ওপর, ১৩ই অগাস্ট ভোরে বরুণ দেবতা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলকাতায় । অঝোরে বৃষ্টি আর সাথে মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত । বেরোতে পারা যাবে এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয় । বিধাতা বোধহয় তখনই সাবধান করছিলেন বাবা মায়েদের । দুটো হাড়জ্বালানে পাগলকে এক ছাদের তলায় থাকতে দেবার বন্দোবস্ত করাটা আদৌ ঠিক হচ্ছে কি ? বাবা মায়েরা তখন বোঝেন নি । আমরা তো নয়ই । বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে উঠতেই ভিজে জুবুথুবু সক্কলে । এটা অবশ্য আমাদের বেড়াতে যাবার ঐতিহ্য ।

আমরা বেরোবো আর বৃষ্টি হবে না এমনটি কখনো হয়নি। সুতরাং বেশি ঘাবড়ালাম না। গুয়াহাটির উড়ান যদি বাতিল না থাকে নিশ্চই পৌঁছাবো কোনো এক সময়ে। সেযাত্রায় আমরা প্লেনে উঠলাম এবং আকাশে উঠলোও সে উড়ান। আর তার পরেই শুরু হলো খেলা। মনে আছে, অনেকদিন আগে কলেজ থেকে নিক্কোপার্ক গেছিলাম কজন বন্ধু মিলে। ওখানে একটা রাইড ছিল নাম ভুলে গেছি, সেই ভয়ানক রাইড-এর অভিজ্ঞতা আবার শুরু হলো গুয়াহাটির সেই প্লেনে। তারপরে আরো কয়েকবার খারাপ আবহাওয়ায় আকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু গুয়াহাটির সেবারের অভিজ্ঞতার কাছে সেসব নস্যমাত্র। মনে হলো এইবার এই জন্মের শেষ। দুই হাতল চেপে ধরে বসে আছি, ভাবটা এমন, যেন প্লেন ভেঙে পড়লেও আমার সিট-এর হাতলদুটো আকাশে ঝুলে থেকে আমায় বাঁচাবে। মহাতিমিরেরও শেষ হয় কিন্তু কলকাতা থেকে গুয়াহাটির ওই চল্লিশ মিনিটের বুঝি শেষ নেই। খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছালে মানুষ ভয় পায়। আরো খারাপ অবস্থায় পৌঁছালে মানুষ আরো ভয় পায়। কিন্তু ক্রমাগতঃ আধঘন্টার উপর যদি ওই মারাত্মক ভয়ানক ভয় পেতে হয় তখন বোধহয় ভয় পেতে পেতে, ভয় পেতে পেতে, বুকের সব ভয় শেষ হয়ে যায়। কেমন সাধক সাধক হয়ে যায় মনটা। 'Near death experience' -এর পর যেমন মানুষের আত্মিক উন্নতি হয় বলে শুনেছি, আমারও মনে হয় তেমনি হলো। হঠাৎ মনে হলো, সবাই তো একসাথেই আছি। মরলে সবাই একসাথেই মরবো। তবে আর চিন্তা কি। চোখ খুলে পাশে তাকিয়ে দেখি, পাশের সিটে একটু বাঁদিক চেপে জানলায় তাকিয়ে আছে মা। বললাম, ''ভয়ের কিছু নেই, আবহাওয়া খারাপ তো তাই প্লেন একটু কাঁপছে।'' মা বললো, ''দেখ, কত মেঘ চারিদিকে।'' মনে পড়লো, এটাই মা বাবাদের প্রথম আকাশ যাত্রা। বুঝলাম, অজ্ঞানতা যে সবসময় ভয়ের জন্ম দেয় তা নয়, অনেক সময় অজ্ঞানতা খুব খারাপ পরিস্থিতিতেও যাত্রাপথটাকে উপভোগ করার মানসিকতা যোগায়। যেহেতু মা জানে না যে আকাশ যাত্রায় এই পরিমান ঝাঁকুনি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, তাই তার মনে কোনো ভয়ের উদ্রেকই হয়নি। প্রথম আকাশযাত্রাকে অবলীলায় উপভোগ করছে। শিশুর মতো। সব কিছু তাড়াতাড়ি জেনে ফেলার, পৌঁছে যাবার তাড়ায় আমরা জানার পথটাকে উপভোগ করার শিশুসুলভ আনন্দটাকেই মেরে ফেলেছি ধীরে ধীরে। মায়ের হাতটা ধরে বলেছিলাম মনে আছে, ''তোমার ভালো লাগছে মা ?'' আমার স্বল্পভাষিনী মা ইতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়েছিলেন। এই উড়ান যদি শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় গুয়াহাটির মাটি স্পর্শ নাও করতো সেদিন , তাহলেও বোধহয় শেষ সময়ে কোনো আক্ষেপ থাকতো না আমার।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভালোয় ভালোয় আমাদের আকাশযান যে গুয়াহাটির মাটি স্পর্শ করেছিল সেদিন, তা বলাই বাহুল্য। গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট থেকে একটা গাড়ি নিয়ে সোজা গেলাম ময়ুর হোটেল, গুয়াহাটির স্টেশন-এর কাছে এই হোটেলেই আমি এর আগে একবার দু-রাত্রি ছিলাম। সেবার এক বড়ো শক্তিসাধকদের দলের সাথে এসেছিলাম কামাখ্যা মন্দির দর্শনে। সে অন্য গল্প। এবার আমাদের পরিকল্পনা ছিল গুয়াহাটি থেকে শিলং যাবার আগে মায়েদের কামাখ্যা মন্দির ঘুরিয়ে দেখানোর। তাই কয়েকঘন্টার জন্য বড়ো কোনো হোটেল বুকিং না করে চেনা হোটেলেই ঘাঁটি গাড়লাম। হোটেলের ঘর খুব একটা পছন্দসই হবে না সেটা আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু জানলা থেকে বাইরে একটা নবনির্মিত স্টেডিয়াম দেখে সকলেরই বেশ পছন্দ হলো। হোটেলে স্নান সেরে হোটেলের উল্টোদিকের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা কামাখ্যা মন্দির।

কামাখ্যা মন্দিরের মাহাত্ম্য তার স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে নয়, তার প্রাচীনত্বে, তার পৌরাণিকতায়, মানুষের আজন্মকালের বিশ্বাসে, নানান কথকথায়, অপতান্ত্রিক বিদ্যার কাহিনীতে। আসামের নীলাচল গিরির এই মন্দির

আসমুদ্র হিমাচল একান্ন শক্তিপীঠের এক গুরুত্বপূর্ণ পীঠ বলেই মানে। এই মন্দিরের পৌরাণিক কাহিনী সবারই জানা। তাই তার আর পৌনঃপৌনিকতা করলাম না। গতবারে এসে প্রায় একবেলা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল মনে আছে। কিছু একটা পুণ্যতিথি ছিল সে সময় হয়তো। এবার মন্দিরে বিশেষ ভিড় নেই। একশ টাকার টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়ালাম। পাঁচশো টাকার টিকিটও আছে। সোজা গর্ভগৃহের আগের অংশে এসে ঢুকেছে। আমরা লাইন দিলাম অহম রীতির দোচালা নাটমন্দিরের সাধারণ পথে। আর চারশো টাকা বেশি দেওয়া পুণ্যার্থীদের টাকা বেশি, তাই ভক্তিও বেশি, আর তাই ভিড় এড়িয়ে সোজা ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবার সুযোগও বেশি। ভারতের প্রায় সব মন্দিরের মতোই। অবশ্য যদি ওই গর্ভগৃহের বাইরে কোথাও ভগবান নামক ধারণাটি না থাকেন তবেই। তা সে যাই হোক, নাটমন্দিরের লাইনে দাঁড়িয়ে একটা কথা মনে হচ্ছিলো, এই সম্পূর্ণ শক্তিপীঠটির মাহাত্ম্য — নরনারীর যৌনতা, প্রজনন ক্ষমতা, যা কিনা ধরিত্রী মায়ের শসশ্যামলা রূপটিরও একটি রূপক, তাকে স্বাভাবিক মর্যাদা দেবার জন্য। নারীর ক্ষেত্রে ঋতুচক্র যার অন্যতম প্রধান বহিঃপ্রকাশ। এখানে আসা পুণ্যার্থীরা অসীম ভক্তি ভরে গর্ভগৃহের ঐতিহাসিক অন্ধকার পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছোট্ট বেদিতে মাথা ছোঁয়ায়, ভক্তিভরে পৃথিবীর গর্ভ থেকে পাথরের ফাটল বেয়ে স্বাভাবিক নিয়মে উঠে আসা জলের ধারাকে আদিমাতার যোনিনিসৃত পবিত্র তরল বলে চোখে, বুকে স্পর্শ নেয়। অথচ সেই পুণ্যার্থীরাই আবার রজঃস্বলা নারীকে পূজার্চনায় বাধা দেয়। অম্ববাচীতে কামাখ্যাতে পুণ্যের লোভে ভিড় উপচে পড়ে, অথচ বাড়ির ঠাকুরঘরে পুজোর দিনে বাড়ির মেয়েটির প্রবেশ নিষেধ থাকে শুধুমাত্র তার শরীর তাকে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মে প্রজনন উপযুক্ত ঘোষণা করেছে বলে। আমরা যুগের পর যুগ ধরে কামাখ্যা মায়ের যোনীপিঠে মাথা ঠেকিয়ে কে জানে কত পুণ্যই না অর্জন করে চলি স্থাবর ধার্মিকতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। মনে পড়লো, একবার সরস্বতী পুজোর দিন সকালে উঠে নিজেকে রজঃস্বলা দেখে খুব কষ্ট পেয়ে মাকে বলেছিলাম, আমি এবার অঞ্জলি দিতে পারবো না ? তখন সেই সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া দিনে, সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি হয়তো একমাত্র ভগবানের কাছে সরাসরি ভবিষ্যৎ জীবনের অ্যাপ্লিকেশন বলে মনে হয়েছিল। মায়ের উত্তর ছিল, ''তোর কি খুব অঞ্জলি দিতে ইচ্ছে করছে ? তাহলে দে। সরস্বতী সব জানেন। ''মা অঞ্জলীর মন্ত্র বলেছেন আর আমি সেই সেই মন্ত্র শুনে বাড়ির ছোট্ট সরস্বতীর মূর্তির পায়ে ফুল দিয়েছি। তারপর কোনোদিন আর এই 'অপবিত্রতা' নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে হয়নি।

কামাখ্যা মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকলে পাপ-পুণ্য, পৌরাণিকতা সব ছেড়ে যে বোধটি মনকে ছেয়ে থাকে তা হলো রহস্যময়তা। ছোট্ট পিচ্ছিল অন্ধকার সিঁড়ি, নিচে ঠান্ডা ভেজা ভেজা একটুকরো জায়গা, ঘিয়ের প্রদীপ ছাড়া কোনো আলো ঢোকার রাস্তা নেই। তার মধ্যে ফুল সিঁদুর-এর মিশ্রগন্ধ। ধূপ-ধুনো জ্বালানো নিষেধ। ধোঁয়া বেরোবার জায়গা নেই বলেই। মায়েরা পুজো দিলেন। বাইরে বেরিয়ে দশমহাবিদ্যার মন্দিরগুলি আর মন্দির চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখলাম সবাই। মন্দির চত্বরে শত শত উৎসর্গিত পায়রা। মানুষের মানত পূর্ণ হয়েছে, তাই কামাখ্যা মায়ের ভেট।

আগে হলে হয়তো বলি হয়ে যেত। ভারতবর্ষ যে বিশ্বাসের দেশ, যেকোনো মন্দিরে বা তীর্থস্থানে গেলেই এই কথাটি সর্বাগ্রে মনে হয়।

বেশি সময় নেই, আজই শিলং পৌঁছানোর কথা আমাদের। মন্দির থেকে নেমে এলাম। হোটেলে অল্প করে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোলাম শিলং-এর উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মপুত্রের নদীদ্বীপের মাঝে আগের বার দেখা ভৈরব মহাদেবের মন্দিরটিও ব্রহ্মপুত্রের বুকে দেশি নৌকায় করে সেই দ্বীপে পৌঁছানোর মনোমুগ্ধকর যাত্রাটির কথা গল্প করলাম সকলের কাছে। এছাড়াও পড়ে রইলো নবগ্রহ মন্দির সহ প্রাচীন অহম রাজাদের আরো কত পুরাকীর্তি। সময় কম থাকার জন্য এবার বাকি আর কাউকে সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়াতে পারলাম না।

গাড়ি চলছে শিলং-এর দিকে। বর্ষায় গুয়াহাটি থেকে শিলং যাঁরা গেছেন তাঁরা জানেন যে প্রকৃতির সবুজ রং বলতে কি বোঝায়। হিমালয় এখানে সমতল ছুঁইছুঁই। বাবা অনেককাল হিমাচলে কাটিয়েছে। তার কাছে পাহাড় বলতে একদিকে খাড়া পাথুরে দেওয়াল, অন্যদিকে খাড়া নেমে যাওয়া খাত। শিলংয়ের রাস্তায় দুপাশে সবুজ ঢালু মাঠ, ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট

ছোট্ট বাড়ি, মাঝে জঙ্গল আর অল্প অল্প পাহাড় । বাবার কাছে শিলং-এর পাহাড় অন্যরকম রূপ নিয়ে ধরা দিলো । বাবার সাথে সাথে বাকি সকলেরই চোখে মুখে ততক্ষণে বর্ষাভেজা খাসিপাহাড়ের সবুজ এসে বাসা বেঁধেছে ।

সুন্দর চলছিল আমাদের গাড়ি । হঠাৎ সামনের সিট থেকে শুনলাম, ''গাড়িটা একটু থামাও ।'' গাড়ি থামলো, আরোহী নামলেন, পাহাড়ি পথে, গাড়ির দুলুনিতে গুলিয়ে ওঠা পাকস্থলী খালি করলেন, তাঁকে জল-ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হলো । এ পর্যন্ত পুরোটাই পাহাড়ি পথের অতি সাধারণ ছবি । কিন্তু, যেটি অসাধারণ ছিল সেটি হলো, অসুস্থ ব্যক্তিটি আমার হবু শ্বশুরমশাই আর গাড়িতে আমাদের সঙ্গে আছেন আমার হবু শ্বাশুড়ীমা । ভবিষ্যতে নানা অহেতুক ভীতি আর চিন্তার কারণে যাঁকে আমি 'শ্রীমতি চিন্তামণি' বলে ডেকে থাকি । তো সেই ঘটনায় পাহাড়ি রাস্তায় অনভ্যস্ত শ্রীমতি চিন্তামণি তো ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন । গাড়িতে ওঠার আগে একটি নির্দোষ croissant-এর ওপর তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো । তাঁকে সবাই মিলে কিছুতেই বোঝানো গেলোনা যে ওটি আমরা সকলেই খেয়েছিলাম । এটা পাহাড়ি পথে অনেকেরই হতে পারে । আমি ভাবছি, মরেছে রে, croissant খাওয়ার বুদ্ধিটা আমারই । বিয়ের কথা বলতে এসেই হবু শ্বশুরমশাইকে অসুস্থ আর হবু শ্বাশুড়ীমাকে চিন্তায় ফেলে দিলাম, বিয়ে অবধি ব্যাপারটা গড়ালে হয় শেষ পর্যন্ত । যাই হোক, ভীষণ চিন্তা করতে করতে শ্রীমতি চিন্তামণি তো শেষে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লেন আর আমরা ১৩ই অগাস্ট সন্ধ্যে নাগাদ শিলং-এর লাবং অঞ্চলে 'বনি গেস্ট হাউস' -এ এসে উঠলাম । এটি হোটেল পাড়া নয় । সাধারণ স্থানীয় জনবসতির মধ্যে ছোট্ট ঘরোয়া গেস্ট হাউস । আন্তরিক । আরো ভালো ব্যাপার, আমরা ছাড়া আর কোনো গেস্ট নেই । মাঝের খাবার আর আড্ডা দেবার জায়গাটা পুরোটাই আমাদের । পৌঁছেই দুটো ঘরে দু জোড়া বাবা মা কে বিশ্রাম করতে দিয়ে আমরা বেরোলাম পুলিশবাজারের দিকে ।

পুলিশ বাজার শিলংয়ের প্রধান বাজার বা চক অঞ্চল । ওখানেই মেঘালয় ট্যুরিজমের অফিস । সেই অফিসে গিয়ে পরের দিনের চেরাপুঞ্জি ট্যুর-এর ছয়টা টিকিট বুক করলাম । কাল চেরাপুঞ্জি । বর্ষায় কেমন থাকে সে দেশ, দেখার সাধ পূর্ণ হবে ।

পরদিন ১৪ই অগাস্ট, সক্কাল-সক্কাল জল-বিস্কুট-অ্যাভোমিনের প্যাকেট গুছিয়ে পুলিশ বাজারের মেঘালয় ট্যুরিজমের অফিসের সামনে । ছোট্ট পনের সীটের দুটি বাসে শুরু হলো জার্নি । সেদিন কিন্তু বৃষ্টি নেই । মনে মনে ভাবছি, চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি পাবো তো ? বাস ছোট্ট ছোট্ট মেঘালয়ী সবুজ গ্রাম পেরিয়ে চলেছে ছোট ছোট সবুজ টিলার গা ঘেঁষে । আশেপাশে দূষণের লেশমাত্র নেই। প্রতিটি বাড়ির সামনে ছোট্ট টব বা পাত্রে ছোট্ট ফুলের গাছ । অপূর্ব জীবনযাত্রা । হয়তো নাগরিক জীবনের অনেক সুবিধা থেকেই বঞ্চিত এখানকার মানুষ । আমি দুই দিনের জন্য বেড়াতে এসে ভাবছি কি সুন্দর', যেমন সমস্ত টুরিস্টই ভাবেন । আমরা যথার্থ ভ্রামণিক হয়ে উঠতে পারবো না কোনোদিনই হয়তো । তাই ট্যুরিস্টের দৃষ্টিভঙ্গিতেই মনে হয়েছে কি সুন্দর । তবে জীবনযাত্রার অসুবিধার কথা বাদ দিলে, বর্ষায় মেঘালয় সম্পর্কে একটাই বিশেষণ মনে হয়, 'অপার্থিব ।' একটা খচখচানি হচ্ছিলো মনের মধ্যে চেরাপুঞ্জি চলেছি কিন্তু বৃষ্টি নেই । এতো কান্ড করে বর্ষাকালে এলাম চেরাপুঞ্জি বৃষ্টি দেখবো বলে । এমনসময়, চারপাশটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগলো । ক্রমশঃ এমন হলো যে, বাসের সামনে কয়েকফুট মাত্র দেখা যাচ্ছে । বাস থেমে গেলো । এখানে নাকি একটি ভিউ পয়েন্ট আছে । মাউকডক ভিউ পয়েন্ট । বাস থেকে নেমে বুঝতেই পারছিনা কোথায় ভিউ পয়েন্ট ? কোথায় কি ? সামনে একটা ব্রিজের আবছা অবয়ব চোখে পড়লো । সূচীভেদ্য অন্ধকার হয় জানি । সূচীভেদ্য কুয়াশা কি তাহলে এটাই ? পাশ থেকে বাসের ড্রাইভার বললেন, ''চলে যান এই সিঁড়ি দিয়ে ভিউ পয়েন্ট পেয়ে যাবেন ।'' হাতে চায়ের গ্লাস । পাশেই একটা চায়ের দোকান আর তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে সিমেন্টের বাঁধানো সিঁড়ি । কুয়াশায় এতক্ষণ চোখেই পড়েনি । নামতে নামতে মনে হলো, এটা তো মেঘ, কুয়াশা তো নয় । আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি । বঙ্গোপসাগর থেকে চার-পাঁচশো কিলোমিটার পথ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ধেয়ে এসে জলভরা মৌসুমী বায়ু সোজা প্রথম ধাক্কা খেয়েছে মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে । পুঞ্জীভূত হয়ে ওপরে উঠেছে । আর এই খাসিপাহাড়ের চেরাপুঞ্জিকে, চিরকালের মতন পুঞ্জীভূত মেঘের দেশে পরিণত করেছে । তাই তো এ রাজ্যের নাম মেঘালয় । ছোটবেলায় পড়া ভূগোলকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখে মেঘকে কি করে যেন কুয়াশা বলে ভুল করে ফেলেছিলাম । ভিউ পয়েন্ট থেক কিছুই প্রায় দেখা গেলো না মেঘের জন্য । বাবা মায়েরা দেখলাম বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা । এমনকি শ্রীমতি চিন্তামনিও চিন্তা ছেড়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত । দেখে ভালো লাগলো । ফিরে এসে বাস ছাড়লো Duwan Singh

Syiem Bridge যা কিনা সোহরা সার্কিটে ঢোকার সীমানা, সেটা পেরোতেই দলে দলে মেঘ এসে সঙ্গী হলো আমাদের। বৃষ্টি পরছে না কিন্তু গা ভিজে যাচ্ছে জলভরা মেঘের সংস্পর্শে। ইকো পার্কে এসে বাস থামলো। সাধারণ পার্ক যেমন হয়, কিন্তু এই পার্কের বৈশিষ্ট্য হলো, এখান থেকে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের সমতল ভূমির অপূর্ব একখানি দৃশ্য দেখা যায়। হঠাৎ করে মেঘ সরে গিয়ে সে দৃশ্যের কিছুটা আমরাও দেখলাম। এই বর্ষায়, সোহরার পাহাড় থেকে নেমে আসছে অজস্র ঝর্ণা। দূরে সবুজ পাহাড়ের গায়ে রচনা করেছে দুধসাদা আল্পনা। এরপর শুরু হলো সত্যিকারের বৃষ্টি। জামাকাপড় যদিও আগেই স্যাঁত্যস্যাঁতে হয়ে গেছিলো। থাঙ্গখারঙ্গা পার্কে এসে যখন বাস দাঁড়ালো তখন চারিদিক বৃষ্টিতে ছেয়ে গেছে। অন্য সকলেই প্রায় বর্ষাতি নিয়ে এসেছে। আমরা বোকার মতন বাড়িতে বর্ষাতিগুলো বাক্সবন্দী করে রেখে বর্ষাকালে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে এসেছি কয়েকটা পুরনো হয়ে যাওয়া ছাতা নিয়ে। দুই জোড়া বাবা মাকে নিয়ে একসাথে বেরোনো হচ্ছে এই আনন্দেই বাকি আর কিছু নজরে পড়েনি বোধহয়। তা সেই পুরোনো ছাতাদের তো চেরাপুঞ্জির বর্ষালী হাওয়া, ঠাট্টার সুরে একদমকেই অকেজো করে দিলো। বাস থেকে নামার পাঁচ মিনিটেই দেখলাম, বাবার ছাতার হাতল আর ছাতার ওপরের অংশ আলাদা হয়ে গেছে। হাতলহীন ছাতার ওপরের অংশটুকু কোনোক্রমে ধরে রেখে বাবা প্রবল উৎসাহে পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ছাতার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে অবাক হয়ে বাবা বললো — ''বসে রইলি যে ? নামবি না ? চলে আয়, চলে আয়। ''বুঝলাম, বয়স বেড়েছে ঠিকই কিন্তু বেড়াতে বেরোলে উৎসাহের এটুকুও কমতি হয়নি আমার বাবার। লাফিয়ে নেমে এলাম বাস থেকে। মায়েরাও ততক্ষণে শাড়ি টাড়ি সামলে হাত ধরাধরি করে গুটি গুটি এগোচ্ছে পার্কের গেটের দিকে বৃষ্টি আর হাওয়ার সাথে লড়াই করে। আপাত দৃষ্টিতে থাঙ্গখারাঙ্গ পার্ক তেমন মনে রাখার মতন কিছু হয়তো হতো না কারণ মেঘের জন্য বাংলাদেশের সমতলভূমির প্রায় কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই থাঙ্গখারঙ্গ পার্ক আমাদের সমগ্র শিলং চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের প্রধান ট্যাগলাইন হয়ে রয়ে গেছে এখনো। সেইটিই এখন বলবো। আমরা দুজন এদিক ওদিক ঘুরছিলাম। বৃষ্টির মধ্যেই। এমন সময় হঠাৎ শুনলাম চিৎকার, ''এই তোরা কোথায় এদিকে আয়, দেখে যা। তাড়াতাড়ি আয়।'' বাপি মানে আমার তৎকালীন হবু শ্বশুরমশাইয়ের গলা। কি হলো রে বাবা ? চশমা, মোবাইল সব হওয়ার চোটে উড়ে খাদে পরে গেলো নাকি ? পড়ি কি মরি করে গিয়ে দেখি, ষাট ছুঁই ছুঁই মানুষটা, এঁনাকে আমি ঘরকুনো বলেই জানি, তিনি পনের বছরের ছেলের মতন আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করছেন পার্কের ঠিক পাশ দিয়ে তিন ধাপে নেমে যাওয়া বর্ষার ভরা যৌবনা Kinrem falls কে দেখে।

ঝর্ণার দূর্বার গতি বয়সের ভারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দেখার আনন্দ টুকুকে রেখে। তখনও তিনি উচ্ছোসিত হয়ে বলে চলেছেন, ''কি দৃশ্য ! উফ, কি দেখলাম।'' আর আমার ষাটোর্ধ বাবা ভাঙ্গা ছাতা সামলে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে একদিক থেকে আর একদিকে যাচ্ছে আর বলছে ''শাড়ি যায় যাক, জুতো যায় যাক, আবার হবে, এই দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখে নাও।'' বৃষ্টিতে সবারই শাড়ি জামাকাপড় আর জুতোর সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিলো। মায়েরা বোধহয় তার আগেই এই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আর তাতেই বাবার এই মন্তব্য। মায়েরাও ততক্ষণে শাড়ির মায়া ছেড়ে ছাতা টাতা বন্ধ করে বিপুল বেগে বয়ে চলা ঝর্ণার গতি আর বর্ষালী সবুজ মেখে যেন কিশোরী হয়ে উঠেছেন। আর এই পুরো দৃশ্যটার ভিডিও সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এখনো সেদিনের কথা মনে করায়। সেখান থেকে Nohkalikai Falls, ভারতের উচ্চতম ঝর্ণা। এই ঝর্ণার নামকরণ নিয়ে একটি ভয়ানক গল্প কথিত আছে, বিধবা লিকাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলো। তার দ্বিতীয়স্বামী মনে করতো লিকাই তার চেয়েও তার পূর্বপক্ষের সন্তানকে বেশি ভালোবাসে। সেই ঈর্ষায় সে, লিকাইয়ের অনুপস্থিতিতে, ছোট্ট শিশুটিকে মেরে তার মাংস রান্না করে রেখেছিলো। যা লিকাই কাজ থেকে ফিরে এসে না জেনে খেয়ে নেয়। পরে জানতে পারলে সন্তানহারা সেই মায়ের কি অবস্থা হতে পারে তা সবাই আন্দাজ করতে পারেন। লিকাই রাগে শোকে আত্মহারা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এই ঝর্ণায় পড়ে মারা যায়। সেই থেকে এই ঝর্ণার নাম নোহকালিকাই ঝর্ণা। সোহরা পাহাড়ের বৃষ্টি আর মেঘ আমাদের সেই ঝর্ণা দেখতে দিলো না। তা বোধহয় একদিকে ভালোই হলো। কেবল শুনলাম প্রবল গর্জন। আজও যেন সন্তান শোকাতুরা মা লিকাই রাগে, দুঃখে গুমরে চলেছে। প্রবল মেঘ, তার সাথে মিশেছে আছড়ে পড়া ঝর্ণার বাষ্প আর অবিরল বৃষ্টি। নোহকালিকাইয়ের উপস্থিতি আমরা তার শব্দে প্রবলভাবে অনুভব করলাম, ঝর্ণার ঠিক ওপরেই নির্মিত রেস্তোরাঁয় বসে দ্বিপ্রাহরিক খাবার খাওয়ার সময় হয়তো তার বাষ্পও গায়ে মুখে মাখলাম, কিন্তু

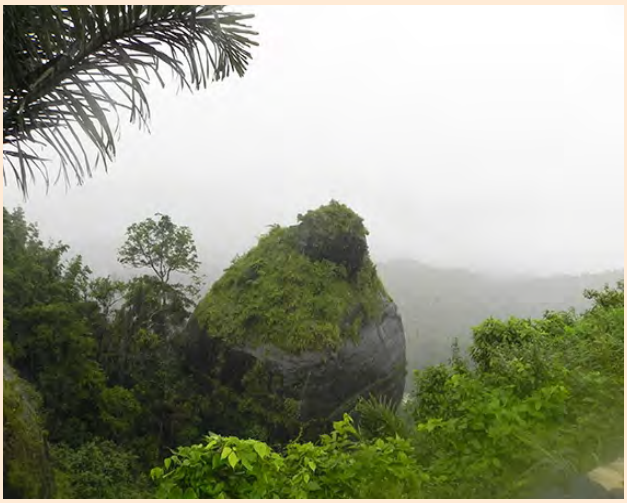

তার চাক্ষুষ দর্শন পেলাম না। দুর্ভেদ্য মেঘ আর বাষ্পের মিশ্রণ সমস্ত জায়গাটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে।

চললাম মাওসুমাই গুহার দিকে, প্রকৃতি নির্মিত গুহা, জল চুঁইয়ে পড়ে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত সব আকৃতি। পিচ্ছিল গুহার ভেতরে আলোর ব্যবস্থা অবশ্য বেশ ভালোই। গুহার একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা। ভেতরে একএকটা জায়গা এতোটাই সঙ্কীর্ণ যে কোনোমতে একজন মানুষ মাথা নিচু করে ঢুকতে পারে। ক্রনিক আর্থাইটিসের দুজন রুগীকে নিয়ে গুহার শেষ পর্যন্ত না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো। তবে যতটা দেখলাম তাতে করে এরকম স্ট্যালাগটাইট গুহা দেখার সাধটা গেলো বেড়ে। মোট্রোপ রক দেখলাম, যা প্রকৃতিক আবহবিকারে নির্মিত একটু দৈত্যাকার শাঙ্কবাকৃতি পাথর। অনেকে শিবলিঙ্গও বলেন। অদ্ভুত আদিম জায়গাটা। খাসি উপজাতির শত শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য সাক্ষী করে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকৃতি পাথর। কোথায় পৃথিবীর কোন গর্ভে প্রোথিত তার মূল, মানুষ তার হদিস পায়নি। আর আজকের ক্ষুদ্র আধুনিক আমরা, আরো ক্ষুদ্রতর মন সম্বল করে তাকে দেখতে এসেছি, প্যাকেজ ট্যুরের একটি পয়েন্ট হিসেবে। হায় রে।

ফেরার পথে বৃষ্টির বেগ কমেছে। ততক্ষণে অবশ্য কারোরই আর জামা-জুতো ভেজা নিয়ে বলার মতন কিছু নেই। কতবার যে চুপচুপে হয়ে ভিজেছি, আর কতবার যে সে জল গায়ে শুকিয়েছে সারাদিনে তার হিসেবে নেই। ফেরার পথে রামকৃষ্ণ মিশনে কিছুটা সময় কাটালাম। তারপর সোজা বনি গেস্ট হাউস। পরদিন সোমবার ১৫ই অগাস্ট। আমরা ঠিক করেছিলাম এই দিন আমরা শিলং দেখবো। আসলে শনি রবি সোম পরপর তিনদিন ছুটিটাও আমাদের এই সময় এখানে আসার একটা কারণ। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, ১৫ই অগাস্ট আসাম এবং উত্তর পূর্ব ভারত প্রায় বন্ধ থাকে। বোরো আন্দোলনকারীরা ভারতীয় স্বাধীনতাদিবসে বেশ কিছু সমস্যা করার পর প্রশাসন থেকে এই ব্যবস্থা নিয়েছে। সন্ধ্যের পর একটু দোকানপাট খোলে। সুতরাং ১৫ই অগাস্ট সারাদিন আমরা ঘরেই বসে রইলাম। বাবা মায়েরা বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা করলো যেটা এখানে আসার তাঁদের দিক থেকে একটা মূল কারণ। আর আমাদের কারণ এই অছিলায়, দুই পরিবারকে দু একদিন পরস্পরকে চিনতে সাহায্য করা। বাঙালি বিয়ে তো দুজনের মধ্যে না, দুই পরিবারের মধ্যে হয়। আমরা সারাদিন, খেয়ে ঘুমিয়ে, বাগানে ফুলের ছবি তুলে শেষে বিকালে সবাই মিলে বেরোলাম। পায়ে হেঁটে আশপাশটা দেখে গেলাম পুলিশবাজার। মায়েদের ইচ্ছে এখন থেকে কিছু কিনে দেন আমাদের দুজনকে। কোনো দোকানপাট খোলা নেই প্রায়। শেষে অর্ধেক ঝাঁপ ফেলা একটা দোকান থেকে দুজনে দুটো বাড়িতে পরার স্লিপার কিনলাম, যে দুটো সেই ভ্রমণের স্মৃতি নিয়ে এখনো আমাদের সাথে আছে।

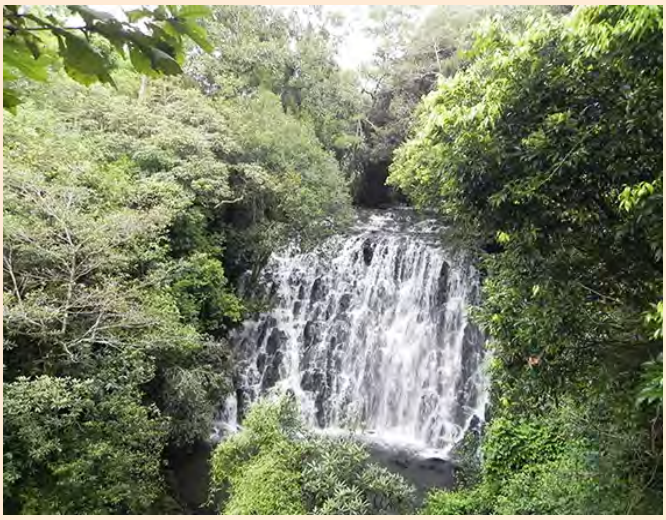

পরদিন আমরা সারাদিন ধরে দেখলাম শিলং। এলিফ্যান্ট ফলস গিয়ে কেউই বিশেষ বিমোহিত হলো না কারণ গতকালই সবাই বর্ষার ঝর্ণার রূপ দেখে এসেছে। শিলং গলফকোর্স বেশ লাগলো সবার। অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম। এটি এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক

গলফ কোর্স। দেখলাম ক্যাথিড্রাল অফ মেরি হেল্প অফ খৃষ্টানস। স্থাপত্য হিসেবে শিলং-এর সবচেয়ে বড়ো ক্যাথিড্রাল এটি। ইংরেজদের বসতি সূত্রে শিলংয়ে খ্রিষ্টধর্ম ছিলই। মনে পড়লো, মনিপুরী বন্ধুটির কথা। হিন্দু রাজ্য মনিপুরে ছিল বৈষ্ণব্য প্রাধান্য। সেই সুত্রে আমার এই বন্ধুটির বাড়িতেও বৈষ্ণব ধর্মের রীতি। মনিপুর থেকে শিলংয়ে পড়তে আসা ছেলেটি, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী অন্য বন্ধুদের সাথে চার্চের অনুষ্ঠানে যেত। ক্রমশঃ তার মনে হলো সে ধর্ম বদল করবে। ভাবনাটা যদিও খুবই অপরিণত। একমাত্র মানবধর্ম বাদে কোনো ধর্মই কি স্বয়ং সম্পূর্ণ? এতো কেবল অন্য থালায় বসে একই ভাত, একই তরকারি খাবার মতন বিষয়। তাও সেকথা মনিপুরে তার বাড়িতে বলতে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার তাকে ঘরবন্দি করলো। ছেলেটি কিন্তু পালালো বাড়ি ছেড়ে। পাকাপাকি ভাবে বদল করলো ধর্ম। সেকথা শুনে, আজকের এই আধুনিক যুগেও আজ থেকে মাত্র বছর কুড়ি আগে আমার বন্ধুটিকে তার বাবা কোনোদিন ক্ষমা করেননি। ছেলেটি বাড়ি যেত না। গেলেও দিদিদের সাথে দেখা করে চলে আসতো। একদিন বলেছিলো সব ঘটনা। নিজের লোকেরা তাকে পর করে দিয়ে ছিল বলেই হয়তো দুনিয়া তার বন্ধু হয়েছিল। বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বুঝি তার কাছেই শিখতে হয়। শিলংয়ে এই চার্চে এসে আমার কেবলই মনে পড়ছিলো এক বিশেষ মতাদর্শের জন্য পরিবার ত্যাগ করা আমার সেই পাগল বন্ধুটির কথা। আমার একমাত্র উত্তর-পূর্বভারতীয় বন্ধুটির কথা। চার্চ থেকে শেষ বিকালে গেলাম শিলং পিক। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। দেখা যাচ্ছে পুরো শহরটা। দূরের শিলং শহরের ঝিলমিলে আলো আর শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ায় আলোআধাঁরী শিলং পিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম সবাই, পুরো পরিবার, একসঙ্গে। এরপর আর কখনো সবাই একসাথে কোথাও যাওয়া হয়নি।

এখানেই আমার কাহিনী শেষ হতে পারতো কিন্তু হলো না। কারণটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। পরদিন ১৭ই অগাস্ট গুয়াহাটি থেকে আমাদের ফেরার ট্রেন। শিলং থেকে গাড়িতে সোজা লটবহর নিয়ে গুয়াহাটি রেলস্টেশন। এসে ওভার ব্রিজে উঠে দেখলাম বেশ ভিড়। ভাবলাম কোনো ট্রেন সবে এসে পৌঁছেছে বুঝি তাই ভিড়। বাবা-মায়েদের বললাম ওভারব্রিজেই অপেক্ষা করো কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেবে বা লেট আছে নাকি জেনে আসি। শুধু শুধু সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামার ধকল নেবে কেন। সেসময় আমাদের হাতে স্মার্টফোন ছিল না। সুতরাং স্টেশন এনকোয়েরিই ভরসা। দুজনে এনকোয়েরিতে যাবো বলে প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখি, সেবছরে কুম্ভমেলাটি সেমুহূর্তে গুয়াহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই হচ্ছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। অগুনতি মানুষের মাথা। প্রতি সোমবার সকালে আর শনিবার সন্ধ্যাতে হাওড়া স্টেশন চত্বরের যাত্রী আমরা দুজনেই। মানুষের মাথা দেখে ভয় পাবো এমন বান্দা আমরা নই। ভাবলাম, কয়েকটা ট্রেন একসাথে ঢুকেছে বা কয়েকটা ট্রেন লেট, তাই এই অবস্থা। প্রবল বিক্রমে দেখি দেখি করে তো বহুকষ্টে কাউন্টারের জানলার সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। আর তার পরেই গল্পটা শুরু হলো।

হাওড়া যাবার অমুক ট্রেন কোন প্লাটফর্মে আসবে?

— এখন বলা যাচ্ছে না।

— কেন লেট আছে?

— হ্যাঁ।

— কতক্ষণ লেট?

— বলা যাচ্ছে না।

— ওমা! এ আবার কি কথা? কতক্ষণ লেট সেটা বলা যাচ্ছে না?

এবার বাজটা পড়লো

— মালদায় বন্যা হয়ে রেললাইন ভেসে গেছে। জল না কমলে কিছু বলা যাচ্ছে না। কোনো ট্রেন ওই রুটে চলছে না।

গত তিনদিন বাংলা-হিন্দি-উর্দূ কোনো খবরই শুনিনি। তাই বাজের ধাক্কাটা বড়ো বেশিরকমই লাগলো। ভীড় ঠেলে আবার ব্রিজে বজ্রপাতটা করলাম। আপাতত ঘর চাই থাকার। যা অবস্থা, হোটেলের ঘর গুলো বুক হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। স্টেশনের কাছেই ময়ূর হোটেল। ফের সেখানেই। কোনোমতে চারজনকে ঘরে ঢুকিয়েই বললাম স্নান সেরে নিতে। ফ্লাইটের টিকিট পাই কিনা দেখি। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে প্রশ্ন – ''ফ্লাইট !'' ''সেতো অনেক টাকা ?'' ''অতো টাকা এনেছিস ?'' ''আমাদের থেকে নিয়ে যা।'' ''তাহলে এখন এয়ারপোর্ট যাবি তোরা টিকিট কাটতে ?'' ওরে বাবা, তোমরা স্নান করে আরাম করে বসো, এটিএম কার্ড গুলো আমরা ব্যবহার করি। আর সাইবার ক্যাফে বলে একটা বস্তু পৃথিবীতে আছে। কোনো মতে তাদের ঠান্ডা করে তো বেরোলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে একটা সাইবার ক্যাফের খোঁজও পাওয়া গেলো। তা সে ক্যাফে তে গিয়ে দেখি সেখানে একটি পেজ খুলতে যা সময় লাগে তাতে গুয়াহাটি থেকে প্লেনে করে কলকাতা চলে আসা যায়। আবার খোঁজ-খোঁজ। পাওয়া গেলো একটি ট্রাভেল এজেন্টের অফিস। সেখানে গিয়ে শেষমেশ সেদিন বিকালের ছয়টি টিকিট কাটা গেলো। সমস্যা হলো পেমেন্ট-এর সময়। কার্ডে পেমেন্ট তিনি নেবেন না। আবার খোঁজ খোঁজ এটি এম। প্রথম এটি এম খারাপ, দ্বিতীয় এটি এম খারাপ, তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় পাওয়া গেলো এটি এম কিন্তু লম্বা লাইন। টাকা না শেষ হয়ে যায়। যাইহোক সেযাত্রা সেটি আর হয়নি। টিকিট পাওয়া গেলো। আর এই দৌড়াদৌড়ির পুরোটাই ভিজে ভিজে। বৃষ্টি আবার আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। সব ব্যবস্থা করে যখন হোটেলে ফিরে এসেছি বাবা মায়েদের নিয়ে এয়ারেপোর্টের দিকে বেরোবে বলে, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনি শ্রীমতি চিন্তামণি বিয়ে সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তার কাজটি একটু এগিয়ে রাখছেন এইবেলা। হবু বেয়ানকে বলেছেন, ''আমাদের বরযাত্রী তো বেশি হবে না, এই পঁচিশ-ত্রিশ জন।'' আর আমার শ্বশুরমশাই তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, ''আরে, আগে বাড়ি পৌঁছবে কি করে সেটা ভাবো, ছেলে মেয়ে দুটো এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় ছুটছে, টিকিটের ব্যবস্থা করতে পারলো কিনা কে জানে ?'' কথোপকথন শুনে হাসবো না রেগে যাবো বুঝে উঠতে না পেরে বললাম, ''তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, খেয়ে নিয়ে এয়ারপোর্ট, তিনটেতে ফ্লাইট।''

রাতে কলকাতায় ফিরে এসে বাবা বললো, ''এই তোরা ছিলি বলে ব্যবস্থা করে আজ ফিরে আসতে পারলাম। নইলে আমরা কি করতাম ? টাকাপয়সাও তো সীমিত ছিল।'' বললাম, ''এটি এম কার্ডটা ব্যবহার করলেই তো পারো।'' সঙ্গে সঙ্গে বরাবরের মতন ফর্দ শুনিয়ে গেলো যে, কবে কাগজের খবরে বা চেনা কার কার এটি এম কার্ড থেকে কত টাকা চুরি হয়েছে। বললাম, ''সতর্ক ভাবে ব্যবহার করলে কেন চুরি হবে ? সবাই তো ব্যবহার করে, আমরাও তো ব্যবহার করি। এটি এম কার্ড থাকলে এরকম পরিস্থিতিতে কত সুবিধা বলো। নইলে তো নিজেই বললে ফিরতে পারতে না।''

এটি এম কার্ড ভালো না মন্দ সে মীমাংসা অবশ্য আজও হয়নি। দুপক্ষই যে যার জায়গায় অনড় থেকেছে। শিলং ভ্রমণে আরো অনেক কিছুই হয়নি। বড়াপানির ধারে বসে সন্ধ্যে নামা দেখা হয়নি, মাওনিংলং-এর গ্রামের আজন্মের পরিচ্ছন্নতার পাঠ নিয়ে আসা হয়নি। খাসি গ্রামের মাতৃতান্ত্রিক জীবনযাত্রাও শিখে আসা হয়নি, আদিম গাছের শিকড় জুড়ে বানানো জীবন্ত সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটা হয়নি, ব্রহ্মপুত্রের বুকে দেশি নৌকায় বসে অহমিয়া মাঝির গলায় অহমিয়া গানের গুন গুন এর সাথে সূর্যাস্ত দেখা হয়নি, শত অসুবিধা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বের মানুষদের অনাবিল হাসিমুখের রহস্যভেদ করাও হয়নি। কিন্তু যা হয়েছে তা অনেক। দুটি অপরিচিত পরিবার পরস্পরের পরিচিত হয়েছে। বাকি না হওয়া গুলো না হয় কোনো একসময় হয়ে যাবে।

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

‘‘পাতুড়ি’’

পুরবী মজুমদার, Chicago

পাতুড়ি হলো কলা পাতায় মুড়িয়ে কয়লার নিভু আঁচে পুড়িয়ে নিয়ে রান্না করার একটা অভিনব পূর্ব বঙ্গীয় পদ্ধতি। পাতাপোড়া — পাতা পুড়ি — থেকে অপভ্রংশে — পাতুড়ি।

‘‘পাতুড়ি’’ রান্নার পদ্ধতিটা আগে শুধু পূর্ব বঙ্গীয়দেরই এক চেটিয়া ছিলো। আজকাল মিডিয়ার কল্যাণে এই সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিটি সারা বাংলায়ই জনপ্রিয় হ’য়ে পড়েছে। তাজবেঙ্গলের মতো পাঁচতারা মর্যাদা সম্পন্ন হোটেলেও অনেকদিন ধরেই পাতুড়ি প্রিপারেশনটা একটা অতি জনপ্রিয় মেনু হিসেবে গৌরবের তকমা ধারণ ক’রেছে। এখন তো কোলকাতার বড় ছোট, বিখ্যাত অবিখ্যাত, যে কোন বাঙ্গালী রেঁস্তোরাতেই পাতুড়ি একটা অপরিহার্য মেনু।

পাতুড়ি আমিষ আর নিরামিষ দুরকমই হয়। পূর্ব বাংলায় দুরকমই সমান তালে জনপ্রিয়। ছোটবেলায় আমরা কেউই খুব একটা নিরামিষের ভক্ত ছিলাম না। কিন্তু ঠাকুমার নিরামিষ হেঁসেলের পোস্ত পাতুড়ি, কাঁচা চিনেবাদাম বাটার পাতুড়ি, মটরডালবাটার সাথে একটু নষ্ট হ’য়ে যাওয়া নারকোল কোরার পাতুড়ি, সর্ষে বাটা দিয়ে কচুর লতির পাতুড়ি, কুরোনো নারকোল দিয়ে মানকচু বাটা পাতুড়ি, ডুমো ডুমো ক’রে কাটা কুমড়ো সাথে কুমড়ো বীচি বাটার পাতুড়ি, ঝিরি ঝিরি ক’রে কাটা আলুর আর ভাজা বড়ির সাথে সর্ষে পোস্ত বাটার পাতুড়ি, পোস্ত নারকোল বাটা দিয়ে মুলো ঝিরি ঝিরি ক’রে ঘষে নিয়ে জল ঝরিয়ে আদা কাঁচা লংকা দিয়ে ছোলার ডাল বাটার পাতুড়ি, সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে শাঁপলার ডাঁটার পাতুড়ি, পিঁয়াজ পোস্ত সহযোগে মাশরুম পাতুড়ি (এটা অবশ্যি ঠাকুমার হেঁসেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না পিঁয়াজের কারনে) ইত্যাদি অনবদ্য সব রান্নার রসাস্বাদন করবার জন্য আমরা সবাই উন্মুখ হ’য়ে বসে থাকতাম। বলা বাহুল্য যে ঐ সব পাতুড়ি গুলো খাঁটি ঝাঁঝালো সর্ষের তেল দিয়ে কলা পাতায় খুব নৈপুন্যের সাথে মুড়িয়ে উনুনের নিভু আঁচে দিয়ে দেয়া হোতো। পাতুড়িটা হ’য়ে গেলে সারা বাড়ী প্রাণ মাতানো গন্ধে ম’ ম’ করতো। যেমনটা হয় কাচ্চি বিরিয়ানীর এবং হাঁড়িয়া কাবাবের বেলায় — ওর মিষ্টি খুশবুই জানান দিয়ে দেয় ওগুলো তৈরী হ’য়েছে কিনা। টিপে টিপে পরখ ক’রে দেখতে হয় না সেদ্ধ হয়েছে কিনা। তেমনি করেই পাতুড়ির মিষ্টি গন্ধে আমাদের চোখে দেখা দিতো খুশীর ঝিলিক আর রসনা হোতো রসসিক্ত আসন্ন ভোজনের আলোর আলপনায়। ঐ সব পাতুড়ি যে কি স্বাদিষ্ট ছিলো তা বর্ণনাতীত। আজকাল অবশ্যি আমরা কলাপাতার বিকল্প হিসেবে লাউ, কুমড়ো কিম্বা অনুরূপ যে কোন পাতায় মুড়িয়ে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে তাওয়াতে সেঁকে নেই। তবে তার স্বাদের ‘‘আসমান জমিন’’ ফারাক থেকে যায়। তবে আর কি করা যায়! দুধের স্বাদ আমরা ঘোলেই মিটিয়ে নিই।

আমিষ জাতীয় পাতুড়ির মধ্যে নারকোল পোস্ত দিয়ে ইলিশ পাতুড়ি, পিঁয়াজ কুচো দিয়ে আঢ় মাছ পাতুড়ি, সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে চিংড়ি পাতুরি, ইলিশের ডিম পাতুড়ি, চুনো মাছের পাতুড়ি, সর্ষে পিঁয়াজ সহযোগে সরপুঁটি পাতুড়ি, মৌরলা মাছের গড়গড়া পাতুড়ি, বাঙালীর রসনা সিক্ত করা ফালি ক’রে কাটা সেদ্ধ ডিমের পাতুড়ি ইত্যাদি হাজারো রকমের পাতুড়ির সম্ভারে বাঙালীর হেঁসেল সমৃদ্ধ এবং হেঁসেলের ঝুলি টৈটুম্বুর। অধুনা কোলকাতার বিয়ে বাড়ী গুলোতেও বহুল প্রচলিত ভেটকি পাতুড়িও বেশ জনপ্রিয় হ’য়ে উঠেছে।

আজকে আমি আপনাদের সামনে আমিষ এবং নিরামিষ দু রকম পাতুড়ির রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আশাকরি আপনাদের কাছে হয়ত ভালোলেগে যেতেও পারে।

প্রথমটা হলো পোস্ত পাতুড়ি –

পোস্ত পাতুড়ি

উপকরণ – পোস্ত বাটা – যতোটা সম্ভব মিহি এবং শুকনো ক'রে বাটা কাঁচা লংকা দিয়ে। নুন পরিমাণ মতো আর মিষ্টি স্বাদানুসারে; হলুদ পড়বে না এতে, তবে সামান্য পরিমান দিতেও পারেন। পোস্তর পরিমানের এক চতুর্থাংশ পিঁয়াজ ঝিরিঝিরি ক'রে কেটে (জুলিয়ান কাট) হাত দিয়ে ভালো ক'রে কচলে নরম ক'রে নিয়ে পোস্ত বাটায় মিশিয়ে নিতে হবে। ঠাকুমাদের আদি রেসিপিতে অবশ্যি পিঁয়াজ বর্জিত ছিলো। আপনারা চাইলে পোস্তর সাথে খানিকটা কুমড়ো বিঁচিও বেটে নিতে পারেন। স্থানীয় গ্রোসারী দোকানে papitas নামে প্যাকেট পেয়ে যাবেন।

এবারে সব উপকরণ গুলোকে সর্ষের তেল দিয়ে আলতো হাতে মেখে নেবেন। এ পর্যায়ে এসে আপনারা গোটা ক'য়েক লাউ বা চাল কুমড়ো পাতা ধুয়ে নিয়ে মাইক্রো ওয়েভে দিয়ে হাল্কা নরম ক'রে দু'তিনটে পাতাকে পর পর সাজিয়ে (secure করার জন্য একটু overlapping ক'রে সাজাবেন) এর পর পোস্তর মিশ্রণটা কে পাতার মাঝখানটাতে চৌকো ক'রে বসিয়ে লবঙ্গ লতিকার মতো ক'রে পাতা দিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন। অনেকে ওটাকে সূতলি দিয়ে গিঁঠ বেঁধে ও secure ক'রে নেন। আমাকে অবশ্যি তা করতে হয়নি। এরপর cast iron এর একটা ভারি প্যানকে piping hot ক'রে mini size এর পাতুড়ির wrap গুলোকে পর পর সাজিয়ে দেবেন। একটু পরেই আঁচটা একটু ঢিমে ক'রে দিতে হবে। নতুবা পাতা গুলো পুড়ে যাবে আর ভেতর টা কাঁচা থেকে যাবে। তলার পিঠটা যখন গাঢ় বাদামী রং ধারণ করবে তখন অন্য পিঠটা উল্টে দেবেন। পাতুড়িগুলো যখন হ'য়ে আসবে তখন একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুবে। ঐ পর্যয়ে উনুনের আঁচটা বন্ধ ক'রে দেবেন। হ'য়ে গেলো আমাদের পোস্ত পাতুড়ি। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতে সর্ষের তেল আর কাঁচা লংকা সহযোগে এর জুড়ি মেলা ভার।

মাছ পাতুড়ি –

মাছ পাতুড়ি পূর্ব বঙ্গের একটা অতি প্রিয় আর বহুল প্রচলিত আর সূক্ষ্ম খাবার (delicacy)। নতুন জামাই এলে খাদ্য তালিকায় থাকতো রুইমাছের (fillet) ফিশ ফ্রাই, ডাব চিংড়ি, কাতলা মাছের পেটির সোনালী রং এর তেল জবজবে কালিয়া, ঢাউস সাইজের চিংড়ির মালাইকারি, এক বিঘৎ এর চেয়েও বড়ো এক কথায় পেল্লাই সাইজের চিংড়ির কাটলেট আর যে কোন মাছের (জামাইয়ের প্রিয় মাছ, বোধ করি ইলিশ), যদি ইলিশ হয় তবে পোস্ত নারকোলের পাতুড়ি বানানো ছিলো জামাই তোয়াজের জন্য খবই জনপ্রিয়।

মাছের পাতুড়ি

আজ আমি আপনাদের কাছে ক্যাট ফিশ (cat fish fillet) এর পাতুড়ি নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। আপনারা ছোট বড় যে কোন মাছ দিয়ে (কাঁটা সমেত বা কাঁটা ছাড়া) এটা বানাতে পারেনা।

উপকরণ – বেশ কিছু পরিমাণ মাঝ খানের ডাঁট ছাড়ানো আর মাইক্রো ওয়েভে খানিকটা নরম করে নেয়া কলাপাতা, মাছের টুকরো, বেশকিছু পরিমান কাটা পিঁয়াজ, নুন, লংকা গুঁড়ো (স্বাদানুসারে; একটু ঝাল ঝাল হবে), হলুদ, দু চিমটে চিনি, দুধে গোলা সর্ষে paste (শুকনো

শুকনো) আর সর্ষের তেল । আজকাল ছোটছোট সাইজে মাছের প্রতিটি টুকরোকে কলা পাতায় মুড়িয়ে করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমি দু রকমেরই ছবি দিলাম ।

একটা পাত্রে সমস্ত উপকরণ গুলো আলতো করে একসাথে মেখে ফেলুন । এবার ৪/৫ লেয়ার কলাপাতা একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ওপর রাখুন । এবার সর্ষে-মাছের মিশ্রণটা কে সাজানো কলাপাতার মাঝখানটা তে রাখুন এবং হাত দিয়ে ফ্ল্যাট আর চৌকো সাইজ করার চেষ্টা করুন । প্রথমে কলাপাতা গুলো দিয়ে লবঙ্গ লতিকার মতো করে সাবধানে মুড়ে নিন । এবার নীচে পড়ে থাকা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা দিয়ে আবার মুড়ে নিন । এবার একটা heavy cast iron এর skillet কে ধোঁওয়া ওঠা গরম করে তাতে কলাপাতার প্যাঁচানো মাছ পাতুড়ির wrap টা দিয়ে দিন । মিনিট ৭/৮ পর একটু দেখবেন পুড়ে যাচ্ছে কিনা, তেমন হলে আঁচটা একটু কমিয়ে দেবেন এবং আরও ৭/৮ মিনিট রেখে পুরো জিনিসটা উল্টো পিঠ করে দিন । এ পিঠ টা মিনিট দশ হবার পর দেখবেন চারকোল গ্রীলের একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুবে — তখনি বুঝবেন যে আপনার কাঙ্খিত মাছ পাতুড়িটি হয়ে গেছে । স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এই মাছ পাতুড়ি দিয়েই বাঙ্গালী হেঁসেলের ভরা মজলিশ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় । মুসুর ডাল দিয়ে গরম ভাতে এই পাতুড়ি সত্যিকারেরই রসনা তৃপ্তিকর । এ খাবার পেলে পোলাও কোর্মা লাগে কিসে ?

নিন্ চলুন, আপনারাও বানাবার চেষ্টা করে দেখুন ‘‘ষোলো আনা বাঙ্গালিয়ানা’’ এ পাতুড়িটি; আপনাদের ভালো লাগলে আমার খুব ভালো লাগবে । সবাই ভালো থাকুন — সুস্থ থাকুন !

Editorial

As the fall colors blaze up and the nights grow colder and darker, this month's *Batayan* English section also illuminates vitality and mortality. Tinamaria Penn's poem "Cocoa" contrasts the sweetness of a discount candy bar with the exploited child workers harvesting the chocolate.

In "Spoon" by Viola Lee, a mother's love pours into her child's life with the first mouthfuls of food and sustains her into adulthood.

Allen McNair's "Moon Is Love" combines true romance and nature's beauty. Family stories offer protest and perseverance in Lew Rosenbaum's "On My Mother's 120th Birthday" and unthinking cruelty ignites violence in "It's All In the Family: A Death in the Gunj" a spoiler-free movie review by Abhishek Roy.

Political change can be terrifying in Maureen Peifer's "One November Afternoon", defiantly brave in "My Name Is Ida Mae" by David Nekimken or comical in "Lufthansa Lip Balm" by Mita Choudhury.

As an added bonus, Suparna and Subir Chatterjee share photos and a story of meeting Indian poet Srijato Bandopadhay in a rare performance in Perth, Australia. I hope you find happiness and secrets opening like autumn chrysanthemums in everything you read here in *Batayan.* Thank you for sharing our life stories.

Jill Charles
English Editor

America Is Great

Jill Charles

America is great
In every food bank
Where neighbors give
Rice, canned beans
Apples from backyard trees

America is great
In each public library
When a reader whispers
To her grandchildren
"These books belong to us all."

America is great
In the family cafe
Where Dad rings up the register
Mom slices jalapenos
And Grandpa helps the kids
With long division
In back of a dining room
That smells like home

America is great
On Devon Avenue
In Chicago blessed by
The Hand of Fatima
The Mezzuzah of Moses
The Rosary of Mary
And the Lotus of Brahma

America is great
In the long line at the ballot box
In the town hall meeting
In every block club party
In fireworks on the 4th of July

America is great
In every public school classroom
When a student shares extra pencils
Or stands up to a bully on the playground
And says "No one hurts my friend."

America is great
When we lower the flag to half-mast
And love carries on
And freedom remembers.

Jill Charles grew up in Spokane, Washington as the oldest of four sisters. She majored in Creative Writing at Seattle University and lived in Florence, Italy for four months studying art, history and the Italian language. In 2007 Jill moved to Chicago, where she lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, legal and school office work. Jill performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and the Green Mill in Chicago. Read her jazz age novel, Marlene's Piano, available from Booklocker.com.

An Exciting Book

Larry Ambrose

I want to happen upon an exciting book,
say, about a castaway on a tramp steamer,
stranded on a deserted island
after the crew kills the captain.
Or maybe a daredevil canyon-jumper
who has been jumping over everything since
speeding down the sidewalk as a kid
on his bike toward a little ramp
made of a board with one end propped up
on a stack of bricks.

I could borrow a feeling of menace
with a book like that. I know I wouldn't
really have anything to fear.
It's only a book.
I could put it down and not return until I'm
ready, or life becomes uneventful enough.

Not until I'm ready, not until I feel like
dealing with the leaderless crew
assaulting the poor castaway with whom
I have traded my identity.
Not until I can save the canyon-jumper,
whose motorcycle just might be sabotaged,
and myself.

I would put my trust in the old sailor
on the after deck of the steamer whose nose
can sense when mortal danger is afoot,
the common sense to melt into the
background when the brawl starts,
and who passes down the secrets of survival.

I'd have faith in the old mechanic with
the greasy rags and shiny wrenches,
and his infallible sixth sense,
the motorcycle wizard who can detect
an engine problem from a block away
in five seconds.

The old sailor is foremost of the sea.
He would aid me, but only to reprove
the crew's violation of his sacred
maritime code. The mechanical
master could be driven
to avenge the saboteur's insult
to his professional dignity.

I want it to be about me.
I am the victim.
I am the castaway.
I am the canyon jumper.
My rescue would confirm my nobility,
my liberator's feelings for me,
my value to the world.

Every story is but a single episode
in an unfathomable saga.The cast-away,
the old sailor, the crew will continue the
story,
as will the canyon-jumper, the mechanic,
and their saboteur. I will elect to stay on
in this episode for as long as I wish.
But that does not matter.

I could answer the boarding whistle of
another ship, the lure of another author,
and let the story go on without me,
put the book down, and tell them,

“Exciting book. Good read,”
when they ask how the book was.

Cocoa...

Tinamaria Penn, Chicago

i was happily satisfying my addiction
eating my two for a dollar chocolate bar
my stomach was full of corner store ignorance
untapped into reality involving cocoa plantations
everyday sufferings of children
decent slaves of modern slavery

forced young hands sling machetes
chopping down dreams and vegetation
cut open the cocoa pod and legs
that walk in stride with unpaid hot sunsets
allotment small amounts of food
digested to quiet nights and thoughts
longing to go to school
for once to be a child
who doesn't have to wear rags
for once not to be beaten
whipped for hershey, nestle, and mars
multi-million dollar profit that never
shares chocolate with small crying lips
praying for the ivory coast
to release its oppression grip

Tinamaria Penn is a creative word artist and photographer who enjoys finding beauty in the mundane of everyday life experiences. It is Timamaria's aim to record moments in time through written expression and still pictures to help these moments to continue to live through the viewer's interpretation. Tinamaria now resides in Chicago, and her heart stays true to her Cleveland, Ohio roots. Some of her expressions can be found in her first published book, ***Clarity In Three Dimensions*** on Amazon.com

Destiny

Bani Bhattacharyya, Barrington, IL

My mother isn't in this world anymore, but her comments about how to deal with day to day life often ring in my ears.

During the late nineteen eighties, I came to know Jasmin, a beautiful young lady, who emigrated from Pakistan at the same time I came to the USA from India. We became good friends. One evening, she invited me to her house for dinner together with many of her relatives. I declined her invitation because I was invited to another party that same evening. It was to be at a sophisticated new Indian restaurant in downtown Chicago. I had heard many good comments about the place. Jasmin felt disappointed because of my refusal, but my mind was made up to visit Chicago that evening. I explained to her nicely the reason for not attending her party.

At that time, my husband practiced OB & GYN in Aurora, Illinois. He took off that evening, delegating his practice to his partner. He always carried a beeper even when he was not on call in case he was needed. I starved all day, so that I could consume a heavy amount of food at the new restaurant that evening.

While my husband was driving, his beeper went off. He ignored it, thinking it was a mistake. Again and again, it beeped. By the time we were in front of the restaurant, I could smell the Indian food sitting in the car. Before parking the car, my husband went inside the restaurant just to return the beeper call. I was annoyed as I thought he had no responsibility to answer the call because he wasn't on call at that time.

I waited inside the car, so that I could walk into the restaurant with him after he parked the car. He returned quickly and started the car in a hurry without telling me anything about the call. He drove towards home.

To my silent question he answered, "I've to go back to the hospital right now. My partner is in trouble handling a difficult breech delivery. He needs my help."

I was very hungry by then, but what could I say when there was life and death of a baby and the mother were in jeopardy? So I kept quiet as he drove fast, breaking all the rules of the road. He parked in the doctors' hospital parking lot and hurriedly went inside the hospital without caring for me. I sat in the car with my empty stomach keeping me company. It was dark outside and nobody was around. Without being upset, I prayed for a healthy baby to be born.

Ten minutes later, a security guard came and opened the car door for me with my husband's key and asked me to follow him to the hospital. He took me to the doctor's lounge and requested I wait there per my husband's instruction, because he was helping the other doctor in a Caesarean section to deliver the stuck breech baby.

My stomach was cramping because I had been fasting all day. There was no food in the room only coffee. The coffee shop was closed for the evening. I called Jasmin. She asked me, "Where are you, Bani?"

I told her the hospital's name. She was surprised and asked, "What are you doing there in the middle of the night? Are you OK? Where is your husband? How was your dinner?"

I said, "Slow down. I've had no dinner yet. My husband had to return before we had dinner to help his partner deliver a baby. He is in surgery now."

"I'm coming to pick you up," she said and hung up.

I left a message for my husband in the operating room indicating I was going to Jasmin's house.

She arrived and drove me to her house in her car. Her guests had already eating. It was almost 10:30 PM, but Jasmin served me dinner and sat with me. Then she said, "Bani, I invited you this evening and you refused, do you remember?"

I replied, "Of course." Then I added, "Now I'm remembering something my mother told me, when I was a child, only seven years old."

"What did she say?"

My mother said to me, "God has already decided for you when, where and which food you'll have every day. It's all written in your destiny."

Jasmin answered, "So true," with a sweet smile on her face.

Long after midnight, after arriving at Jasmin's house to take me home, my husband said, "Baby and mother both are doing well."

In spite of Jasmin's delicious Pakistani food, that news was the best treat for me for that special evening, which I'll always remember.

Bani Bhattacharyya — Since my childhood my passion was to write my day to day events. Born in Kolkata, I came to the USA in 1960's. Being married in America, I was busy to fulfill my professional duty and taking care of my family. Now, I live in Barrington, IL and enjoy writing novels, short stories and poems. Many of my articles are now published in Amazon and in various magazines.

Lufthansa Lip Balm

Mita Choudhury

North and South.

Definition-defying Tiresias moment when a Samsonite bag of business-class essentials reveals a stick of Korres balm. No stones?

No rhetoric of malignant tumorous taunts lodged in bones of contention: E-Union-resistant antipathy,

of South sucking up currency,
of burdens borne by North. While austerity sits frowning on cold thrones of stone.

No bodies embalmed with formaldehyde stories of Greek ruins.
Of unequal exchange.
Of monetary pit falls and myopic gains. The here and now of difference loudly
drowning out the cacophony, mocking Aristotelian women, stoned to silence below the drone of Airbus engines.

Unintended benevolence in corporate marketing strategy finds expression 35000 miles above reason and revolution? Thus Korres stands.

With stick to parched lip, not stones, at light end of dark pan-European tunneled transnationalism. And fissure. Blinded by vision.

Moon Is Love

Allen F. McNair, Chicago

The moon comes through the clouds
On a black night that comes clear.
In my love for you, I nibble your ear.
The nighttime orb shines so brightly.

Your lips are ripe sweet cherries.
They cling to mine so cool and wet.
You are, my love so dear to me.
As the moon continues to shine above.

The stars soon come out to play.
The nightly ball is here to stay.
I bless the night more than the day.
My heart is a sponge, not made of clay.

My love for you is ever-present.
I am ready to give my life to you.
Your skin, white against the moonlight,
Glistens with love's rich dew tonight.

You are so radiant with your passion.
My love for you is this night's fashion.
I long for your tender, affectionate embrace.
The moon's rays alight your open face.

Kiss me as many are the stars of heaven.
You make me swoon before the moon.
I can't believe that it's already June.
Four months we have loved under the moon.

The nightly part of the day is ours.
Under the moonlight and the stars.
We own the night and all its parts.
We know the love that is in our hearts.

I, **Allen McNair**, am a self-taught artist and poet inspired daily by the wonders of life around me, and by my present and past experiences. From individual poetic portrayals in my early years of writing, I have graduated to writing and illustrating my self-published epic saga, *I Dream of A'maresh*.

It's All in the Family

A Death In The Gunj — Movie Review

Abhishek Roy

In her directorial debut, Konkona Sen Sharma takes us to the sleepy town McCluskieganj, Bihar (now in Jharkhand), India, during the winter of 1979. Based on a short story by her father Mukul Sharma, which was originally inspired by true events, this film tells a haunting tale of seven days when Nandan Bakshi (Gulshan Devaiah) visits his uncle O.P Bakshi's house (Om Puri and Tanuja as, Anupama, O.P's wife) accompanied by his wife Bonnie (Tillotama Shome), their daughter Tani, Bonnie's promiscuous friend Mimi (Kalki Koechlin) and Nandan's timid, reclusive, sensitive cousin Shutu (Vikrant Massey). The film starts on the seventh day with a reference to a death just happened, without revealing much about the victim or any other associated details. Then it travels back to day one to tell the story in linear "fly on the wall" narrative style, depicting insights of the family, friends, and their relational dialectics, interpersonal politics, tension, dark secrets and events leading to the shocking climax.

Right after their arrival in McCluskieganj, we have been introduced to Nandan's friends, Vikram (Ranvir Shorey) and Brian (Jim Sarbh). With so many characters, it takes time to figure out who is connected to whom and how, but one thing gets very evident from the start; Shutu is a target of unintentional and direct bullying by the adults of the family. With subtle references it is shown that Shutu has recently lost his father and still trying to get over the loss. Although he is a brilliant student, the tragedy affected his exam results. He is very vulnerable, going through a difficult phase of coping with the adult world around him and trying to find some solace and acceptance in his surroundings. But being a soft spoken hesitant young adult he finds himself as being the black sheep of the family, a common victim in all of their pranks and jokes. This indifference, antipathy through series of events leads to the horrific climax which deeply impacts and stays with the audience long after the film is over.

The brilliance of the film lies in its successful execution of telling a story in an unpretentious manner without labeling and underlining it to a specific genre. The language of the film moves smoothly between English and Bengali which reminds me of another debut film, the classic “36 Chowringhee Lane” by the director's mother Aparna Sen. The camerawork by Sirsha Roy is topnotch creating a perfect Old World gloomy ambience through yellow and brown hued frames. The minimalistic background music by Sagar Desai and use of folk songs provides a great melancholic backing. The pace of the film is unhurried but not relaxed, keeping the tension and discomforting slow-burn suspense until the last frame.

The film stars an ensemble cast consisting all great and dependable actors like Om Puri, Tanuja, Gulshan Devaiah, Tillotama Shome, Kalki Koechlin, Jim Sarbh, Ranvir Shorey, Aparna Sen (in a voice role) and all of them delivers memorable performances. But the young Vikrant Massey, who has just started his career, stands out in his beautifully crafted haunting emotional portrayal of Shutu.

It is an impressive debut by Konkona and it is undoubtedly one of this year's best films.

My Name Is Ida Mae

David Nekimken, Chicago

My name is Ida Mae.
I am a member of the human race.
I am black and I'm proud.
I am female and I'm powerful.
I am a full American citizen
even as the white powerbrokers say I ain't.

My name is Ida Mae.
I have a right to peaceful protest
outside the movie theater.
You, Mr. Cop,
as you're dragging me away,
say I'm blocking the entrance,
disturbing the peace.
Black folks and poor folks have been blocked
from quality healthcare, quality education, living wage work
for a long, long time.
It's time to disturb the peace and comfort of you rich white folks.

My name is Ida Mae.
You going to arrest me Mr. Cop,
for exercising my First Amendment rights?
You say I'll get a fair trial.
I have my doubts, but I will be represented.
I will have my day in court.
I will not be silenced.
I won't give you a reason for using your gun or your nightstick.
Resisting arrest isn't going to stick.

My name is Ida Mae.
Like the movie marque says
I am a Defiant One.

David Nekimken is a senior citizen who has been a poet most of his life, with poems published in a few publications. He has a self-published book of poems *Anything and Everything Goes*. He is a grandfather with three wonderful grandchildren. He currently lives in a housing co-op in Hyde Park.

On My Mother's 120th Birthday: The Ideas of a New Generation

Lew Rosenbaum

My mother, Anna Hodos, was born June 24, 1896. The place was Oshmyany, a town at that time in Lithuania. I write "at that time" because it was close to the border with Russia, and, from time to time, was either in the Russian empire. . . or not. Borders are often political constructs imposed by imperial states, after all.

My grandfather brought his family to the United States ahead of the Russian (czarist) army attempting to conscript him (we believe that he assumed the name Hodos to escape conscription; when we talked about it, my sister Greta and I could never be sure what their real surname might be). They came to the U.S. after the failure of the first Russian revolution of 1905, traveling across Europe and shipping to the U.S. from Liverpool, England. Arriving in Ellis Island in 1906, my grandmother was turned away because she had an eye infection, trachoma. In the late nineteenth and early twentieth centuries, trachoma was the leading reason for immigrants to be deported from Ellis island. She returned to Europe with her youngest child, to return some time later through Canada. I can only imagine her fear at leaving her family behind to go back to Liverpool, knowing no English; her strength returning to Liverpool, only to fight her way back to her family in the U.S.

The family must have had some kind of network to rely on. It was a time of great Eastern European immigration to the U.S. The garment factories and the tenements where the garment workers lived in New York were filled with Jewish refugees from the pogroms of Eastern Europe. Upton Sinclair wrote about Lithuanian immigrants to Chicago in his epic novel of the same period, The Jungle. Several Lithuanian language newspapers served that large community and periodicals in nearly every other European language brought the news to those working in the stockyards and the steel industry. Branches of my family would settle in New York and Chicago, but my grandparents settled in the small industrial and farming community of Ansonia in Southern Connecticut. The town was situated on the Housatonic River valley, the home of metal industries and textile mills. My family must have brought some resources with them, because they established a feed and grain store serving the agricultural community.

I believe that my mother finished high school. She was slated to work in the store while her younger brother went to college. Regardless of her educational level, she was caught up in the intellectual ferment of the period. She would have none of being bound to the small town store. Greta told me that she ran away to New York to try to make her way there, but her father came after her and brought her back to Ansonia. She remained rebellious, however, and joined the

radical movement of the time, the YPSLs or Young People's Socialist League, and was influenced by the Russian Revolution of 1917. In 1919, John Reed (at that time perhaps the best known journalist in the U.S.) published his pathbreaking *Ten Days That Shook The World*, describing his observations while in Russia during the revolution. Anna got a letter from Reed along with a copy of the book. Reed wrote that "the Capitalist press is endeavoring to suppress the sale of the book," refusing to review it and give it any distribution outside of the big cities in the Northeast. He appealed to the Comrades to help distribute the book and to make money for their collectives at the same time.

New ideas permeated the immigrant working class movement in this period. The big garment workers unions, headquartered in Chicago and New York, led organizing drives in New York and New England. The Triangle Shirtwaist Factory fire in New York in 1911 killed over 100 workers and sparked the fight for labor law reform for the next two decades. The Bread and Roses strike engulfed the textile mills of Lawrence, MA in 1912, with 23,000 workers taking to the streets, defying ethnic differences that the employers had used to keep them apart. Workers and intellectuals around the world rallied in defense of the anarchists Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti, accused of murder in 1920 and executed in 1927 in Boston.

In this turmoil Anna met Meyer Lederman, pictured above in 1922 with her. He styled himself something of a "socialist Zionist," though I never knew what he meant by that. There was, among the socialist leaning Jewish workers of the period and going back to the late 1800s, a trend to argue that wherever there was a Jew, the Jewish nation existed. This group refused to integrate themselves into the revolutionary organizations of the nations in which they lived, demanding a separate organization for themselves. This strand of socialism sparked debates in the garment workers movement. Perhaps this was a fundamental disagreement between Anna and Meyer; that I do not know. After the Communist Party was formed, she became part of that movement, but she and Meyer remained friends to the end of his life.

But somewhere in the early 1920s she met George Rosenbaum, whose last name she would assume without ever getting married. George never became a citizen.. Anna considered him an anarchist if he had any definitive political philosophy. He made friends with people on Book Row in Manhattan, worked in the Dauber and Pine used book shop, and then opened up his own store as the depression deepened. The store went out of business in a few years, and from the store he took what he thought were

some of the valuable titles and about 25 volumes of Russian and Soviet politics and history. The fear of deportation hung over his head throughout his life. His and Anna's memory of the Palmer raids to arrest and deport radicals (1919-1920) revived in the post WWII McCarthy witch hunt.

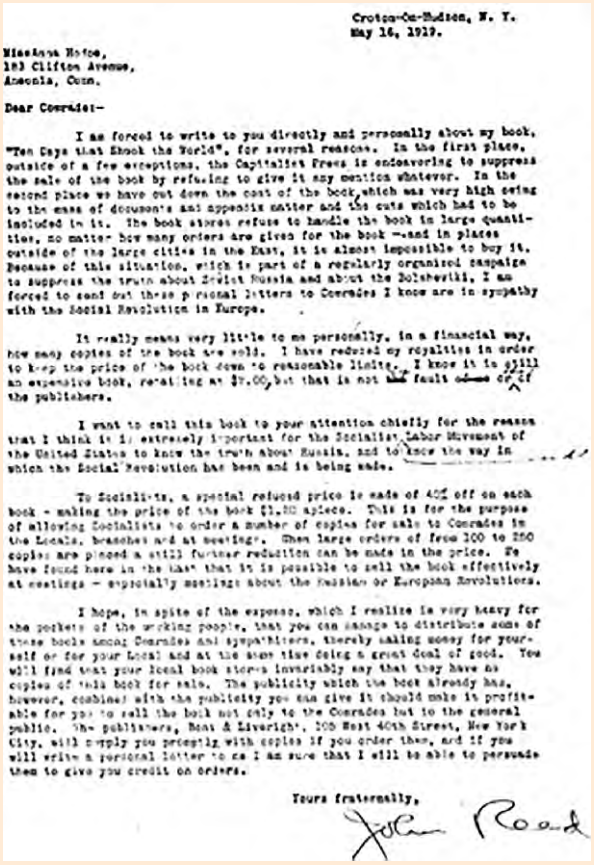

From this union came my sister in 1928, and me in 1942.

Croton-On-Hudson, N. Y.
May 16, 1919.

Miss Anna Hofoe,
183 Clifton Avenue,
Ansonia, Conn.

Dear Comrade:-

I am forced to write to you directly and personally about my book, "Ten Days that Shook the World", for several reasons. In the first place, outside of a few exceptions, the Capitalist Press is endeavoring to suppress the sale of the book by refusing to give it any mention whatever. In the second place we have cut down the cost of the book, which was very high owing to the mass of documents and appendix matter and the cuts which had to be included in it. The book stores refuse to handle the book in large quantities, no matter how many orders are given for the book --and in places outside of the large cities in the East, it is almost impossible to buy it. Because of this situation, which is part of a regularly organized campaign to suppress the truth about Soviet Russia and about the Bolsheviki, I am forced to send out these personal letters to Comrades I know are in sympathy with the Social Revolution in Europe.

It really means very little to me personally, in a financial way, how many copies of the book are sold. I have reduced my royalties in order to keep the price of the book down to reasonable limits. I know it is still an expensive book, retailing at $2.00, but that is not my fault or of the publishers.

I want to call this book to your attention chiefly for the reason that I think it is extremely important for the Socialist Labor Movement of the United States to know the truth about Russia, and to know the way in which the Social Revolution has been and is being made.

To Socialists, a special reduced price is made of 40% off on each book - making the price of the book $1.20 apiece. This is for the purpose of allowing Socialists to order a number of copies for sale to Comrades in the Locals, branches and at meetings. When large orders of from 100 to 200 copies are placed a still further reduction can be made in the price. We have found here in the East that it is possible to sell the book effectively at meetings - especially meetings about the Russian or European Revolutions.

I hope, in spite of the expense, which I realize is very heavy for the pockets of the working people, that you can manage to distribute some of these books among Comrades and sympathizers, thereby making money for yourself or for your Local and at the same time doing a great deal of good. You will find that your local book stores invariably say that they have no copies of this book for sale. The publicity which the book already has, however, combined with the publicity you can give it should make it profitable for you to sell the book not only to the Comrades but to the general public. The publishers, Boni & Liveright, 105 West 40th Street, New York City, will supply you promptly with copies if you order them, and if you will write a personal letter to me I am sure that I will be able to persuade them to give you credit on orders.

Yours fraternally,
John Reed

I'm thinking of Anna today, June 24, of course, since she would have been 120 years old on this day. But there's more. We are immigrants, the objects of the kind of hatred that the presidential race in the U.S. today is stoking. My people would have been those Trump would ban from immigration; after all, we bore the infection of Bolshevism. We were the wave upon wave of immigrants who took jobs from Americans in the steel plants and stockyards, driving the wages down. We were the scum feared by the voters in the British election to exit the European Union. I'm thinking of Anna today, because the Lithuanian/Russian border is today even more a figment of the political imagination, as is the U.S./ Mexican border.

In the era of globalization information flows freely, ignoring borders. Capitalist relations have flown freely to the far reaches of the earth, leaving no nation untouched. Attempts to limit labor migration fail very much for the reason that labor follows the trail of capital and information. You can no more build a wall against labor than you can against electrons. But just as in 1919, when John Reed wrote to my mother, the new ideas and experiences of the immigrants in our society add to our understanding of the world. A social revolution is brewing today, even more than in 1919, because of the globalization and the electronic/technological revolution that has taken place.

Anna died in 1983, the same year that the bookstore I worked in got a computer. She would not recognize the world of today, almost 100 years after the third Russian Revolution of 1917. She would see instantly that the expectations of her working class life no longer beckon to the class created by the computer. And I suspect she'd quickly understand, that broad equality of poverty represents something fundamentally different in the new class structure of America and the world. Her generation could expect to participate in the expanding economic benefits accruing to workers. Reforms would take care of that. This generation can only reform society by taking it over, by wresting power from those who control the means of producing what we need to survive. By wresting power from those who are accelerating their calls to ban immigrants and build walls.

Our ideas and hopes, which come from the lived experience of our expectations, pose the real danger to the rich and powerful. I think Anna would be eager to distribute these ideas, just as she was called on to distribute the ideas of her generation.

One November Afternoon

Maureen Peifer, Chicago

Another dreary November day, gray clouds scudding across the lake sky, the small strip that could be seen from the multi-paned windows in Sister Mary Henry Clare's Latin class. Early afternoon, sophomore year. Glancing out, wishing I were walking along the breakfront at Montrose Harbor instead of hearing the endless alternate clacking of Sister Henry Clare's false teeth closing just before her lips did and the huge black rosary beads suspended from her habit's concealed belt smacking into each other, as she vigorously shouted out, ''-**BO, -BA, -BI, -BIMUS, -BITUS, -BUNT,**" punching her arms cheerleader style to help us memorize the first conjugation Latin verb endings (and you know, it worked! I still know 'em).

"Come on, girls, louder now, again, **-BO, -BA, -BI, -BIMUS, -BITUS, -BUNT !**

Left side go!"

"Right side, that's it you're winning! Front row! Now, back row!"

"Christ," I thought," will she ever shut up!"

Clack, clack, clack, clack-clack, clack-clack, clack.

Suddenly, the PA box crackled mid- bimus and our principal Sister Mary Rosetta's voice came haltingly through," Girls, bad news. The president's been shot in Dallas. School is canceled for the remainder of the day. You are to gather your belongings and go home immediately. Do not, I repeat, do not stop along the way. Go straight home, using your normal route."

Sister Mary Henry Clare threw herself to the floor, on her knees, keening loudly from deep in her gut, fingering her rosary beads.

"Let us pray, girls ,before you leave. Let us pray a decade together for him." We all knelt unthinkingly, tears rolling down some faces, shock and incomprehension on others.

"Our Father who art in heaven," Henry Clare began, and blindly we prayed along. ''forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us."

Midway through, the PA crackled again and Rosetta's tearful voice came through. "Our beloved President Kennedy has died girls at 1:43 p.m. in Dallas. Pray for his soul as you leave. Go straight home and," voice cracking now, "pray!"

Sister Mary Henry Clare was now fully prostrate, weeping shoulders shaking. "Just go, just go," she muttered without lifting her face. "Do as Sister Rosetta said. God help us all."

Numb, silent, we shuffled out, pulling on coats and jackets over our blue and gray uniforms, mindlessly stuffing books and papers in bookbags, grabbing purses, bus passes, filing out of the building to catch the 141 Sheridan or the Irving Park or the 36 Broadway home.

No one thought to do anything but what we were told, even the punkiest greasers among us. Crying, stunned, we walked to our bus stops- the usual small crowd to Broadway and Irving where the 36 would carry us to Rogers Park and - what ? - home ?

Would there ever be home again?

Would the world ever be the same with no John F. Kennedy?

Was it because he was Catholic?

Too young? Too handsome?

Who could do such a thing?

That November 22nd, 1963, hate and death entered my world.

Maureen Peifer is a Chicagoan with a lifelong love of literature, writing, travel, and teaching. She is currently the school librarian at a Montessori school where she previously taught. Her summers are spent in Amsterdam, which inspired this poem.

Pilot Terror

Kathy Powers, Chicago (September 2001)

Infinite reports immerse our senses,
Colossal towers melt to charred rubble,
Mighty radio transmitters relay immutable silence
Abandoned cars populate parking lot cemeteries.

A voiceless nation mutely scrambles,
Prepares never-used trauma stations,
Collects unneeded blood and organs:
Powdered remains need no nourishment.

Skyjackers, people-erasers expunge
Big Apple's workforce to DNA dust.
Vapors spew acrid breath over
Body-part raindrops.

Tacit pandemonium watchers, struck dumb in awe,
Monitor newspeak and comprehend not,
Why terrorists airbrush NYC's skyline in
Smoldering, sooty, steely, smoked down.

I am a civil rights activist who developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.

Spoon

Viola Lee, Chicago

She ate from it often when I bought it for her.
I fed her warm, buttered sweet potatoes, airy
avocados with pinch of lime, food full of love
and food full of good fat. She became curious
and so I showed her how how to use it, my hand
over hers and our hands moving towards her mouth, food
moving into body, insisting on using it alone. She will grow
into decades passing and this spoon will be mixed
in with bamboo skewers, a silver egg beater
never ever once used, and a black vegetable
peeler we thought was gone. Years and years will go by
and that same spoon will be tossed and thrown in box
to grow dusty and old in a closet somewhere
in a very fast smart expensive city where
she and her loved one will fall asleep as all young
lovers do and they will hold each other tightly
in the shape of C: C for carnage, cooling,
covering then spooning each other, drunk with calm,
fertile and full of want. A cycle will begin
and the spoon will move out and will move towards the mouth
of a different daughter providing the best of
what is full, imperfect constantly moving towards
that warmth, that heat, feeding that part of you, her, me,
all of us as we age even in the daylight
growing large and round, full.

Viola Lee was born and raised in Chicago, Illinois. She studied Poetry at Loyola University Chicago and received her MFA from New York University. Her poem *City of Neighborhoods* was published in an anthology of Chicago poetry called City of the Big Shoulders which was published by the University of Iowa Press. Her manuscript Lightening after the Echo was published by Another New Calligraphy last year. She teaches 6-9 year olds at Near North Montessori School and lives in Chicago with her husband, her son and her daughter.

Swarga in America

Souvik Dutta, Chicago

Niagara Falls is a favorite tourist destination of all Indians. I still remember the fun-filled trip Amrita and I had with a bunch of friends back in 2010. We took the Amtrak from Chicago to Buffalo, and then rented a car from there. Of course, I have visited Niagara Falls again with family visiting from India.

Digging deep into the history of a place is my inherent nature. I cannot help it, this weirdness about me. During our first trip to Niagara Falls, like any other tourist who visits the grand and great Americas, we took a tour. One of the places the tour guide took us to was a museum in the falls. The one portrait that caught my attention was that of a Native American girl riding a canoe into the falls. The portrait had a caption - "The Legend of the White Canoe." I asked my tour guide about it, but he couldn't satisfy my curiosity, so I did what I have always done (and love doing), I researched this further.

Six tribes (Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca and Tuscarora) were the first settlers in the region of the Great Lakes. These nations (tribes) formed the powerful northeast Native American confederacy, also called the Iroquois Confederacy. The Iroquois people had their own legends. They believed that at the bottom of the Great Falls lived Hinon, the god of thunder and lightning.

There are many versions of the legend of the white canoe. Some say a girl of the Oneida tribe was being married to a person against her wishes, so she glided in her white canoe, offering herself to Hinon who accepted her as his bride. Others say the girl was offered as a sacrifice to Hinon to protect the people from untimely death, and she became the bride of Hinon or one of his sons. Nevertheless, in all versions, this maiden (Lelawala) becomes the Maid of the Mist.

However, I was more interested in the Native American legends of Hinon. Hinon was particularly worshiped for a great deed he did for the people of the region. Just after creation, the waters of the Great Lakes were stolen and captured by the great serpent demon Oniare. Hinon fearlessly fought the demon, defeated him and freed the waters of the Earth (the Great Lakes). Hinon is said to hurl his thunderbolt on wrongdoers to punish them, and is also known to fancy beautiful women of the tribes, fathering demi-gods with them.

I would now like to draw a parallel between the Hinon legends of the Iroquois tribe with a culture separated by thousands of miles on the other side of the planet, the Vedic culture.

indrasya nu vīryāṇi pra vocaṃ yāni cakāra prathamāni vajrī |

I will now describe the numerous deeds of the valorous Indra, starting with the most important of all, the Thunder-wielder.

ahannahimanvapastatarda pra vakṣaṇā abhinat parvatānām ||

He slew the Dragon, then disclosed the waters, and cleft the channels of the mountain torrents.

ahannahiṃ parvate śiśriyāṇaṃ tvaṣṭāsmai vajraṃ svaryaṃ tatakṣa |

He slew the Dragon lying on the mountain: his heavenly bolt of thunder Tvaṣṭar fashioned.

vāśrā iva dhenavaḥ syandamānā añjaḥ samudramava jaghmurāpaḥ ||

Like lowing kine in rapid flow descending the waters glided downward to the ocean.

~ Rk Veda, Hym 1.32

The story of the battle between Vritta & Indra is well-recorded in the *Rk Veda* and numerous other Puranas. The story goes that the waters of the world were captured by the serpent demon Vritta, and Indra fought a terrible battle, defeating the serpent demon and freeing the waters of the world.

One can hardly ignore the parallels between Hinon and Indra. Both are known to be promiscuous, wield a thunderbolt, and fight a serpent demon to free the waters of the world. If we bring in Greek and Roman myths into this same tale, we can say that the similarities between Hinon, Indra, Zeus and Jupiter cannot be ruled out by mere coincidence. Land masses separated by mighty oceans and seas, towering mountains and dense forests, share the same legends cutting across time and civilization - can we just rule this out by saying these are nothing but tall tales of human imagination?

My mother-in-law, while riding the "Maid of the Mist" and entering the dense fall area of the Niagara Falls, looked at me and said “Souvik, if there is a *Swarga* it is here.” I don't really think she was wrong, Indra does live in *Swarga.*

Souvik Dutta works as an IT professional in Chicago, IL and lives with his wife Amrita and son Hridaan. His passion includes study of ancient scriptures, texts and obscure works of Vedic sages. He lectures in and around the country on Vedic philosophies.

Does Art Have to be Smart?

Shreya Datta

What is *art*? It seems difficult to define a word that encompasses so many ideas, although people have tried since ancient times. The attempts range from Aristotle's definition of "the realization in external form of a true idea," to Georgia O'Keeffe's "filling a space in a beautiful way," to Marcel Duchamp's definition of art as a "habit-forming drug." These definitions give us a basis for defining art, but they do not address the connotations art has in society. To some, art can seem ambiguous, mysterious, or even pretentious. When thinking of art, an expensive art gallery in a well-to-do neighborhood may come to mind and can make it seem inaccessible. It can feel as if art has to have some sort of abstract meaning or it cannot be considered art. But art does not have to have a deep meaning and it can come in many different forms. Art can simply be defined as any creative work of expression.

In my own experience with art, I've always felt like I had to figure out what it *really* meant. I can remember visits to art galleries when I was younger when I would walk around the gallery and stare at paintings until I beat a meaning out of them. I would wrack my brain for some sort of abstract message behind each and every painting because I thought art had to have a deeper meaning that what I saw on paper. I felt that if art did not emanate some sort of message that promoted world peace or illustrated the difficult lives of people less fortunate than I, it could not be considered *art*. So in a place specifically designated as an *art* gallery, in my mind, every painting had to mean something. Even today I feel pressure to look for the deeper meaning behind art. Whenever I read poetry, for example, I feel as if I'm not doing the words justice if I do not see something more than the words printed on the page. When I read poetry and the message behind the words elude me, I feel as though I'm incapable of understanding true art. From a young age I felt as if all art had to have that meaning, but art can simply be beautiful and nothing else. Art does not always have to make one feel something. It does not always have to have universal themes or help people escape reality. Art can be any creative work of expression, it can have no other purpose but to be beautiful. Sometimes art can be taken for what it is directly in front of you, and you do not have to search for a meaning.

Art can come in many unexpected forms other than painting in an art gallery. Art includes different forms such as literature, music, and dance. Spoken word such as a public address or a soliloquy can be art as well since they can be creative and expressive. Music can be used to express feeling and emotion as well. Not only is creating music art, but the way someone plays music can be too. Even if someone plays a piece or sings a song composed by someone else, their own style of singing and playing can be creative and expressive and be considered art. Other forms of art include makeup, interior design, and fashion. The way someone puts on makeup, decorates a house, or designs a dress all require creativity and can all be used as means of self-expression and creativity. Art does not just have to be in the form of a painting.

It can sometimes feel as if art must have a meaning or that it belongs in art galleries. Art can seem inaccessible and difficult to understand. Art, however, does not have to have some sort of underlying meaning. Art can just be aesthetically pleasing and can still be considered art and can come in many unexpected forms. Art doesn't have to be hard to understand - it can be simple.

Dawn Train

Balarka Banerjee, Sydney

Somehow I always imagined you on a train
A dawn train curving through the countryside
You
The first to awake in the carriage
Tip toe and sway between the sleeping bodies
To make your way to the very end
Where you kick open the door
Step down the last step
And swing yourself out into the dawn chill
The sound of the train is gone
You can only hear the country heaving
Speaking in rhythm and rhyme
Vast plains of brown and green
Stretching to the smoky morning horizon
Only punctuated by curious cows
The tracks race alongside you
The wires race alongside you
Criss-crossing and bouncing off each other
Just to keep up with you
The orange glow in the eastern grey
Suddenly breaks out into a yellow glare
The first light catches you unaware
As you close your eyes
And smile
The smile I have only ever seen you smile
As you sometimes lay dreaming
As I tried not to wake you
You smile into the dawn
Your hair in rebellion behind you
Even the morning chill
Warms itself against your glow

Kissing your cheeks pink
Before it goes
Whispering reassuringly in your ears
The way I always did
Stripping away your burdens and fears
The way I never could
You hear the country heave
With your secrets
You

You pass the country station
Where these trains don't stop
But only slow down
You don't see the station master
Whose job it is to keep
The trains on time
And loneliness company
But he sees you
On a train
Just like he has always imagined

The father all Ibex! This massive Billy European Ibex was sunning himself and luxuriating in the summer warmth after a cool night on the slopes of the Seehorn, Switzerland. Being easily 500 kg he effortless scratched his hide quarters with the massive parabolic horns he sports!

"by the river's dark I wandered on" - Leonard Cohen